নারদীয় ভক্তিসূত্র

স্বামী ভূতেশানন্দ

নারদীয় ভক্তিসূত্র

স্বামী ভূতেশানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

পরম কারুণিক শ্রীশ্রীমায়ের কৃপায় নারদীয় ভক্তিসূত্রের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের দ্বাদশ সংঘাধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ তাঁর আধ্যাত্মিকতা ও শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন। তিনি বহুবার জাপান ভ্রমণ করেন ও সেখানে বেদান্তের ছাত্রদের কাছে তাদের উপযোগী করে নারদীয় ভক্তিসূত্র সম্পর্কে যে সমস্ত আলোচনা করেন তা পরবর্তী কালে লণ্ডনের 'বেদান্ত' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনটিকে গ্রন্থের রূপ দেবার জন্য পূজ্যপাদ মহারাজের আপত্তি ছিল, কারণ তাঁর মতে তখনও বিষয়টি পূর্ণাঙ্গরূপ পায়নি। পরে অনেকের অনুরোধে পূজ্যপাদ মহারাজ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করেন ও ১৯৯৮ সালে হাসপাতালে থাকাকালীন 'বেদান্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাটি পূজ্যপাদ মহারাজকে পড়ে শোনানো হয় এবং তখন তিনি কিছু কিছু অংশ পরিমার্জনা করেন। এই সম্পাদনার কাজ তাঁর বেলুড় মঠ বাসের শেষ দিন পর্যন্ত চলেছিল। ৫ আগস্ট, ১৯৯৮ সালে শেষ অসুস্থতার সময় হাসপাতালে ভর্তি হবার পরেও এই ভক্তিসূত্রের শ্লোকগুলির অনুবাদ করেছেন। তিনি শ্লোকগুলির ইংরেজী অনুবাদ মুখে মুখে বলে দিতেন ও অন্যরা সেগুলি লিখে নিতেন। পূজ্যপাদ মহারাজ ৬২-তম শ্লোক পর্যন্ত অনুবাদ করেছিলেন, বাকি ২২টি শ্লোকের অনুবাদ পূজ্যপাদ মহারাজের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী সম্পূর্ণ করেন। ঐ শ্লোকগুলির "আলোচনা" অংশগুলি মহারাজের ব্যাখ্যাকে অনুসরণ করেই

লেখা হয়েছে। পূজ্যপাদ মহারাজ-কৃত নারদীয় ভক্তিসূত্রের এই আলোচনা ও ব্যাখ্যা এ বিষয়ে একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলেই গণ্য হবে।

"নারদীয় ভক্তিসূত্র" শুধু ভারতীয় ধর্মসাহিত্যেই নয়, বিশ্ব ধর্মসাহিত্যেও এটি একটি অতি দুর্লভ গ্রন্থ। যারা ভক্তিপথে সাধন করে ঈশ্বরকে পেতে চান, তাদের পক্ষে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকরণ গ্রন্থ এবং দিগ্‌দর্শনস্বরূপ। "নারদীয় ভক্তিসূত্রের" এই অনুবাদ ও আলোচনাটি পাঠককে প্রণোদিত করুক, এই প্রার্থনা।

ইংরেজী থেকে বইটি বাংলায় যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন প্রাক্তন অধ্যাপিকা শ্রীমতী বাসন্তী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সীতা রায়চৌধুরী। এঁদের উভয়কেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্বামী সত্যব্রতানন্দ

ভূমিকা

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কিভাবে আসে এটা একটা বড় প্রশ্ন। উত্তরটা একই সঙ্গে খুব সোজাও বলা চলে, আবার কঠিনও। সোজা বলছি এইজন্য যে, আমরা প্রায়ই শুনে থাকি যে যদি আমরা তাঁর আরাধনা করি, তাঁর কাছে প্রার্থনা করি, সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করি তবে তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আসবে। কথাটা শুনতে যদিও সোজা কিন্তু পালন করা কঠিন। যখনই আমরা এগুলি অভ্যাস করতে চেষ্টা করি বুঝতে পারি এ কাজ কত কঠিন।

কাকে বলে ঈশ্বর প্রেম ? —

প্রথমত ঈশ্বরপ্রেম কথাটির অর্থই আমাদের পক্ষে বোঝা শক্ত। পার্থিব বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ভালবাসার একটা ধারণা আমাদের আছে। আমরা পিতা-মাতাকে ভালবাসি, সন্তানকে ভালবাসি, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন; অর্থ, যশ, মান বা ক্ষমতা ও অন্যান্য অনেক কিছুও আমরা ভালবাসি। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ব্যাপারটা অন্য ধরনের, কারণ তাঁর সঙ্গে আমাদের যে কোন্ সম্বন্ধ তা আমরা বুঝতে পারি না। আশে-পাশের ব্যক্তি বা পরিবেশের মতো তাঁর সম্বন্ধে যে আমাদের কোন অভিজ্ঞতাই নেই। কারণ আমাদের যা ভালবাসার বস্তু তা সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কিন্তু ঈশ্বর তো তা নন। তাছাড়া ঈশ্বর সম্বন্ধে তো আমাদের কোন উপলব্ধিই নেই। ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধে আমাদের সব ধ্যান-ধারণাই

কাল্পনিক মাত্র। অথচ সত্যের বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কোন ভিত্তি না থাকলে কেবলমাত্র অনুমান বা কল্পনা আমাদের বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সেজন্যই ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধে কোন ধারণা করা আমাদের পক্ষে দুরূহ।

কিন্তু দুরূহ হলেও যাঁদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে তাঁরাই আমাদের পথ নির্দেশ করতে পারেন কিভাবে তাঁকে আমরা ভালবাসতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ এমনই এক ব্যক্তি যিনি বলেছেন, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের একটি বিশেষ ভাবসম্বন্ধ থাকা দরকার। ভক্ত একটি বিশেষ ভাব অবলম্বন করে অগ্রসর হবে। তাঁকে পিতা, মাতা বা সন্তান বা অন্য কোন ভাবে দেখবে। এই ভাবের আরোপণ আমাদের সহায়ক হতে পারে। পার্থিব সব ভালবাসার সম্বন্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিতে হবে ভগবানের উপর।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব, ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।

(পাণ্ডবগীতা ২, স্তবকুসুমাঞ্জলি)

ঈশ্বরের সঙ্গে জীব এ রকমই সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে, ভাবতে পারে যে এই পৃথিবীতে তিনিই আমার সর্বস্ব। প্রথম দিকে অবশ্যই এটা একটা অভ্যাস মাত্র, কল্পনা মাত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে এই অনুভব যতই গাঢ় হবে কল্পনাও বাস্তব সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এভাবেই ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এই ঈশ্বরপ্রেমের নামই ভক্তি আর এই ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বরোপলব্ধির ক্ষেত্রকেই বলা হয় ভক্তিযোগ। নারদীয় ভক্তিসূত্রে ঈশ্বরের নাম উল্লেখ না করে শুধু বলা হয়েছে —'সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা'। (নারদীয় ভক্তিসূত্র, শ্লোক ২)

ঈশ্বরপ্রেমের সোপান—

এই জগতে কোন বৃহৎ জিনিসই অনায়াসলভ্য নয়, ভক্তির পথও তাই সহজসাধ্য নয়। এই জীবনে যিনি মহত্তম সম্পদ সেই ঈশ্বরকে লাভ করা কি কখনও সহজ হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার তাই বলছেন, ‘‘ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এঁদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।’’ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৯) ভক্তিমার্গের প্রথম ধাপ এটাই। শাস্ত্রে যেসব আনুষ্ঠানিক পূজা প্রার্থনার কথা বলা হয়েছে তার নাম বৈধী ভক্তি। এই বৈধী ভক্তি বা ভক্তিমার্গের এই প্রাথমিক স্তরটিকে আমরা শিশুদের পুতুল খেলার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ছোট মেয়েরা যখন পুতুল খেলে তখন পুতুলগুলোকে তারা নিজেদের ছেলেমেয়ে বলেই ভাবে। তাদের নাওয়ায়, খাওয়ায়, সাজায়, ঘুম পাড়ায় আর ভেঙ্গে গেলে কাঁদতে থাকে। যতদিন না ভগবানের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়, ততদিন আমাদের এই বৈধী ভক্তি অনুসরণ করতে হবে।

কিন্তু যদিবা আমরা তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করে পূজা প্রার্থনা করি, তখনও আমাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের কতকগুলি বাধার সম্মুখীন হতে হয়। কামনা, লোভ ইত্যাদি আমাদের মনোজগতের বিঘ্নস্বরূপ আর বাইরের বাধা অনুকূল স্থান ও পরিবেশ বা সহযোগিতার অভাব।

পথের বাধাসমূহ ও তার অপসারণ—

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ভক্তের মনে যদি একবার ভগবানের প্রতি ভালবাসা জাগে তবে সব বাধাই দূর হয়ে যায়। "বাঘ যেমন কপ কপ করে জানোয়ার খেয়ে ফেলে, তেমনি 'অনুরাগ বাঘ' কাম ক্রোধ এই সব রিপুদের খেয়ে ফেলে। ঈশ্বরে একবার অনুরাগ হলে কাম-ক্রোধাদি থাকে না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৬৯) অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রতি তীব্র আকর্ষণ ঈশ্বরোপলব্ধির সব বাধা বিঘ্ন দূর করে দেয়। আমরা বলি বটে যে, এই জগতে কত রকম বাধাবিপত্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব বাধাই মনের সৃষ্টি, ঈশ্বরে অনুরাগের সূচনা দেখা দিলে সে সব বাধা আপনিই সরে যায়।

কিন্তু, কিভাবে আসবে তাঁর প্রতি এই সুতীব্র প্রেম? একাগ্র ও আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে নিয়মিত ভজনা করতে করতেই এই ভালবাসার সঞ্চার হয়। পবিত্রভাবে জীবন যাপন করতে করতে মন দিব্য অনুরাগে রঞ্জিত হয়। গোপীরা যখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন তখন যেমন কোন কর্তব্য কর্মই তাঁদের ঘরে ধরে রাখতে পারেনি তেমনি ঈশ্বরপ্রেমিককে কোন পার্থিব বাধাই কখনও আটকাতে পারে না। ঈশ্বরের আহ্বান অপ্রতিরোধ্য। তাই বনের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি যখন বাজত, গোপীরা গৃহকর্মে যতই ব্যস্ত থাকুন না সব ফেলে রেখে তাঁরা ছুটে যেতেন কৃষ্ণ সন্নিধানে। সেই বংশীধ্বনিতে তাঁদের সব কাজ থেকে মন উঠে যেত। ভাগবতে আছে যে, একদিন একজন গোপীকে গৃহে বদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে তাঁর শরীরটাই কৃষ্ণমিলনের পক্ষে বাধাস্বরূপ, তখন তিনি এই স্থূল শরীরটা পরিত্যাগ করে সূক্ষ্মশরীরে প্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন।

'অন্তর্গৃহগতা কাশ্চিদ্‌গোপ্যোঽলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ॥' (১০।২৯।৯)
'...জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥' (১০।২৯।১১)

—তাঁর দেহ পর্যন্ত কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারল না। এই-ই প্রকৃত প্রেম।

ঈশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা ভক্তের সকল বাধাবিঘ্ন দূর করে দেয়। একদিন কথামৃতকার শ্রীম শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, স্ত্রী যদি ধর্মপথে বিঘ্ন হয় তবে কি কর্তব্য? ঠাকুর প্রথমে পরামর্শ দিলেন স্ত্রীকে ভালভাবে বোঝানোর জন্য। কিন্তু তারপর যখন মাস্টারমশায় বললেন, "স্ত্রী যদি বলে, আমায় দেখছ না, আমি আত্মহত্যা করব। তাহলে কি হবে?" ঠাকুর গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "অমন স্ত্রী ত্যাগ করবে, যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন করে। আত্মহত্যাই করুক, আর যাই করুক। যে ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন দেয় সে অবিদ্যা স্ত্রী।" তারপর নিজেই বললেন, "কিন্তু যার ঈশ্বরে আন্তরিক ভক্তি আছে, তার সকলেই বশে আসে—রাজা, দুষ্টলোক, স্ত্রী।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৭৪-৫)

ধর্মপথে অগ্রসর হবার সময় যেসব বাধাবিপত্তি আসে সেগুলি কিভাবে দূর করতে হবে সে সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি নির্দেশ—

প্রথম উপায় প্রার্থনা। যদি কেউ আন্তরিক ভাবে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে তিনি সমস্ত প্রতিকূলতা দূর করে দেন ও সব কিছু অনুকূল করে দেন।

দ্বিতীয় উপায় সাধুসঙ্গ। যিনি একজনের মনকে আধ্যাত্মিক স্তরে নিয়ে যেতে পারেন তিনিই সাধু। তাঁরা পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। তাঁদের

জীবনের মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, অন্যথায় আধ্যাত্মিক জীবনে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ় হতো না।

তাঁর তৃতীয় নির্দেশ, মাঝে মাঝে নির্জনবাস। তিনি একটা উদাহরণ দিতেন, "যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। ...অনেক মাছই জালে পড়ে। ...যারা জালে পড়েছে, অধিকাংশই পালাতেও পারে না। আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে করে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ করে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি। কিন্তু জানে না যে জেলে হড় হড় করে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধজীবের উপমাস্থল।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ২৫) জালবদ্ধ মাছের মতো আমরাও সংসারে বদ্ধ হয়ে আছি। সুতরাং মাঝে মাঝে নির্জনে বাস করে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন। যদি আমরা বুঝতে পারি যে এ সংসার দুঃখপূর্ণ ও অসার তবে আমরা আর সংসারে আকৃষ্ট হব না। আধ্যাত্মিক নিষ্ঠা সংসারাসক্তি ঘুচিয়ে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর লাভের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে। এই ব্যাকুলতাই একমাত্র প্রয়োজন। ঊষার সঙ্গে ব্যাকুলতার তুলনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। "এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো। তারপর সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৩২৬)

ভক্তির পথ সার্বজনীন—

সর্বশেষে এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে ভক্তির পথ সবার পথ, যে কোন ব্যক্তি এই পথ অনুসরণ করার অধিকারি। অতি দুরাচার ব্যক্তিও এই পথে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ উন্নতিলাভ করতে সক্ষম। ভালবাসার ধর্মই এই যে সে শুধু যে ভালবাসে তাকেই পবিত্র করে না, ভালবাসার পাত্রকেও

শুদ্ধ করে তোলে। এই শুদ্ধিকরণ বা রূপান্তর চলে সোপানের নিম্নতম শ্রেণী থেকে ঊর্ধ্বতম পর্যন্ত। ভক্তি মার্গের এটাই মাধুর্য।

নারদীয় ভক্তিসূত্র ঃ

নারদীয় ভক্তিসূত্র ভক্তি সম্বন্ধে একটি অতি সহজ ও সুন্দর গ্রন্থ। এতে চুরাশিটি সূত্র আছে। এই গ্রন্থের রচনাকাল বা রচয়িতা সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে বলা হয় যে, ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ছিলেন এই গ্রন্থের রচয়িতা। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারদের ভক্তি সম্বন্ধে বহু প্রশস্তি করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, দেবর্ষি নারদ সর্বত্র সর্বজনপূজ্য। নারদের জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে ভাগবত থেকে আমরা তাঁর শৈশব সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি (ভাগবত ১।৫ এবং ১।৬)। তাঁর পিতা কে ছিলেন আমরা জানি না কিন্তু মা ছিলেন এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসী। এক সময় সেই ব্রাহ্মণের গৃহে কয়েকজন সাধু অতিথি হয়েছিলেন ও নারদ তাঁদের পরিচর্যা করতেন, তাঁদের সুখ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতেন ও তাঁদের আলাপ আলোচনা শুনতেন। তিনি তখন পাঁচ বছরের বালকমাত্র, কিন্তু তাঁর আন্তরিক ভক্তি ও সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে অতিথিরা তাঁকে ভক্তিমার্গে দীক্ষিত করেন।

কিছুদিন পর সর্পাঘাতে নারদের মায়ের মৃত্যু হয়। অতি প্রত্যূষে অন্ধকারে তিনি ব্রাহ্মণের গরু দোয়াবার জন্য যাচ্ছিলেন, তখনই সর্পদষ্ট হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে। মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে নারদের আর কোন জাগতিক বন্ধন থাকল না। সকল দায়মুক্ত হয়ে তিনি ব্রাহ্মণের গৃহ ত্যাগ করে গভীর অরণ্যে চলে যান এবং প্রার্থনা ও কঠোর তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। কিন্তু সে দর্শন মুহূর্তমাত্র। সেই দর্শনের

অনুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি পুনঃ দর্শনের জন্য কাতর হয়ে ক্রন্দন করতে থাকলে দৈববাণী হয়, এজন্মে তুমি আর আমার দর্শন পাবে না। কিন্তু তুমি যে একবার আমার দর্শন লাভ করেছ তাতেই তোমার জীবন আনন্দে পূর্ণ থাকবে। তুমি ভগবানের গুণগান করে পর্যটন করতে থাক। তারপর থেকেই নারদ ঈশ্বরের নামগুণগান করতে করতে ভ্রমণ করতে থাকেন। এভাবেই নারদীয় ভক্তিসূত্র রচিত হয়।

সূত্র কি? গভীর অর্থবিশিষ্ট একটি ভাবকে অতি সংক্ষেপে অল্পাক্ষরে বর্ণনা করাকেই বলা হয় সূত্র। পদ্মপুরাণে সূত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে যে,

অল্পাক্ষরং অসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমনবদ্যং চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ ॥

— অল্পাক্ষরবিশিষ্ট, অসন্দিগ্ধ, পুনরাবৃত্তিদোষরহিত, অবিকল্প, নির্দোষ, গভীরার্থবোধক ও সংক্ষিপ্ত শব্দসমষ্টিই সূত্র। সূত্র শব্দের অর্থ সুতাও হয়, যে সুতার দ্বারা সমগ্র গ্রন্থটি বিধৃত। গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবসমূহকে সূত্রাকারে লিখে রাখা হয়, যাতে তা সহজে কণ্ঠস্থ হয় ও উত্তর প্রজন্মের জন্য সঠিকভাবে রক্ষিত হয়। নারদীয় ভক্তিসূত্রেও সমগ্র ভক্তিমার্গটি তাই চুরাশিটি সূত্রের মাধ্যমে বলা হয়েছে।

পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেবর্ষি নারদের অনুসরণে ভক্তিমার্গটি বর্ণনা করব। জাপানের বেদান্ত কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় তাঁদের অনুরোধে নারদীয় ভক্তিসূত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছিল। টেপ রেকর্ডে গৃহীত সেই ভাষণগুলিই পরে আমাদের যুক্তরাজ্যের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত 'বেদান্ত' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সেই ভাষণগুলি পরিমার্জিত করে মূল সূত্রের অনুবাদ সমেত পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

সূত্রব্যাখ্যা

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অন্বয় ঃ অথ (অনন্তর—ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে জানবার যোগ্যতা অর্জনের পর) অতঃ (এইজন্য—এই পথটি ঈশ্বরলাভের সহজতম উপায় বলেই) ভক্তিং (ভক্তির বিষয়—ভক্তির লক্ষণ ও ভক্তিলাভের পন্থা) ব্যাখ্যাস্যামঃ (ব্যাখ্যা করব)।

অর্থ ঃ এরপর এইজন্য ভগবদ্ভক্তির বিষয় বর্ণনা করব।

ব্যাখ্যা ঃ 'এখন ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করব' এই সূত্রটি প্রথমে বলে দেবর্ষি নারদ তাঁর আলোচনা আরম্ভ করছেন।

ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে জানবার অধিকারি এক বিশেষ শ্রোতৃবর্গকে উদ্দেশ্য করেই তিনি ভক্তিসূত্র রচনা করেছেন। যে কোন বিদ্যা তাকেই দান করা চলে যার সেই বিদ্যা গ্রহণের ও ধারণার যোগ্যতা বা সামর্থ্য আছে। সকলকেই সব বিদ্যা নির্বিচারে দান করা সঙ্গত নয়, কারণ তা তাদের সাহায্য তো করেই না, উপরন্তু দেখা যায় অযোগ্য অনিচ্ছুক ব্যক্তি গুরুকেই হয়তো উপহাস করছে। এই কারণেই বিদ্যাদানের পূর্বে বিদ্যার্থীর যোগ্যতা যাচাই বা অধিকারি নির্বাচন আবশ্যক। প্রায় সব সূত্রগ্রন্থেই এই একই রীতি অনুসৃত হয়েছে।

প্রথম সূত্রটির মধ্যে দেখা যাবে চারটি বিশেষ অর্থ নিহিত আছে ঃ

১) বিষয়—শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু।

২) অধিকারি—কাদের জন্য এই বিদ্যা অথবা এই বিষয়ে শিক্ষালাভের যোগ্যতা কার আছে?

৩) উপযোগিতা—ভক্তির উদ্দেশ্য বা অভীপ্সিত লক্ষ্য কি? অথবা ভক্তিমার্গ শিক্ষার বা অনুসরণের প্রয়োজন কি?

৪) সম্বন্ধ—ভক্তির যা উদ্দেশ্য তা লাভ করবার জন্য এই যে পথের কথা বলা হবে তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ কি? এই পথ অনুসরণে কি অভীষ্ট সিদ্ধ হবে?

ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করার আগে এই চারটি প্রাথমিক বিষয় বা অনুবন্ধ আমাদের বোঝা দরকার।

সর্বপ্রথম প্রশ্ন—আমাদের আলোচ্য বিষয়টি কি? বিষয় হলো ভক্তি। পরবর্তী সূত্রে নারদ ব্যাখ্যা করছেন ভক্তি কি বা ভক্তি কাকে বলে? দ্বিতীয়ত, কার জন্য এই ভক্তিতত্ত্ব অর্থাৎ কে এর অধিকারি? যারা এই পথ অনুসরণ করতে উৎসুক তাদের লক্ষ্য করেই নারদ ভক্তির ব্যাখ্যা করছেন। যারা নিছক কৌতূহলের বশবর্তী বা বৌদ্ধিক চর্চায় আগ্রহী তাদের জন্য এ গ্রন্থ নয়। যারা এই শিক্ষাকে জীবনে রূপায়িত এবং এই পথ অনুসরণ করে জীবনকে গঠন করতে চায় তারাই এই ভক্তিশাস্ত্রের অধিকারি। এই শাস্ত্রে যা বলা হয়েছে জীবনে তার এক বিশেষ মূল্য আছে। এই কথাটি ভাল করে বুঝতে হবে। ভক্তিমার্গের উপযুক্ত অধিকারি কে? এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা নিজেদের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট নন; যাঁদের জীবনে একটা অভাববোধ আছে অথচ কেমন করে সেই অভাবটা

দূর করা যায় তা বুঝতে পারছেন না অর্থাৎ তাঁরা কিছু একটা খুঁজছেন কিন্তু কিভাবে তা পাবেন তা জানেন না। এই ভক্তিশাস্ত্র তাঁদেরই সাহায্য করবে, তাঁরাই এই শাস্ত্র-জিজ্ঞাসার অধিকারি। মূল কথা, যাঁরা তাঁদের বর্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট তাঁদের অন্যকিছু জানবার বা শিখবার আগ্রহ থাকতে পারে না। এসব ব্যক্তির কাছে যে কোন বিদ্যাই নিরর্থক। যারা এই ভক্তির বিষয় জানবার প্রয়োজনই অনুভব করে না এ বিদ্যা তাদের কোন কাজেই লাগতে পারে না। কেবলমাত্র যাদের এই মানসিক প্রস্তুতি আছে, যা তাদের এই বিদ্যা গ্রহণের যোগ্য করে তুলেছে, যারা এই পথ অনুসরণ করে জীবনে উপকৃত, তাদের জন্যই এই শাস্ত্রের অবতারণা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এর জন্য একটা বিশেষ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। ভক্তিমার্গ সম্পর্কে জানতে হলে অধিকারির সেই বিশেষ যোগ্যতাটি কি? এরজন্য একটিমাত্র বস্তুর প্রয়োজন তা হলো ভক্তিলাভের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা, একনিষ্ঠ আগ্রহ। ভক্তিলাভের আকুলতা ছাড়া অন্য কোন অবান্তর গুণের প্রয়োজন নেই। তবে এই আকুলতা হবে আন্তরিক। কি করে ভক্তি লাভ হবে, ভক্তিপথে অগ্রসর হবেন কিভাবে, সাধক নিরন্তর সেই ভাবনায় নিরত থাকবেন।

ইন্দ্রিয়জ ভোগসুখে মত্ত থাকলে স্বভাবতই হৃদয়ে ভক্তিলাভের বাসনা জাগে না। আর এটাও স্বাভাবিক যে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ শোনবার জন্য তাদের কোন আগ্রহই হয় না। নারী বা পুরুষ যিনিই হোন তিনি যদি ঘোর নাস্তিক হন বা ভগবানে তাঁর বিশ্বাস না থাকে, এ ভক্তিতত্ত্বে তাঁর কোন লাভ হবে না। শ্রীমদ্‌ভগবদগীতায় তাই বলছেন,

'ইদং তে নাঽতপস্কায় নাঽভক্তায় কদাচন।
ন চাঽশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥' (১৮।৬৭)

—এই রহস্যময় উপদেশ কখনও তপস্যাবিহীন, ভক্তিহীন এবং শুনতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে বা যারা আমাকে অসূয়া করে, আমার মধ্যে দোষ অনুসন্ধান করে তাদের বলবে না। স্পষ্ট কথা এই যে প্রকৃত অধিকারি ব্যক্তিই এই ভক্তিতত্ত্বে প্রবেশের যোগ্য।

আরও একটি বিষয় আছে। ভক্তিমার্গের অনুসরণ করবার জন্য বিদগ্ধ পণ্ডিত হবার কোন প্রয়োজন নেই। এমনকি অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও কিছু এসে যায় না। বেদ-বেদান্ত বা অন্য কোন শাস্ত্রদর্শন তো দূরের কথা, ভক্তিযোগ অনুসরণ করতে হলে সামাজিক পদমর্যাদারও প্রশ্ন নেই। ভক্তিপথ সকলের জন্য, সর্বশ্রেণীর জন্য। এ পথের আরও একটি বড় সুবিধা হলো এখানে বয়সের কোন বিচার নেই, বাধানিষেধ নেই। কেউ কেউ হয়তো জন্মান্তরীণ সংস্কারবশত অতি শৈশবকাল থেকেই ভগবানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। এঁদের মধ্যে প্রহ্লাদ, স্বয়ং নারদ, শুকদেব ও আরও অনেকের নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে, যাঁরা আজন্ম ঈশ্বরানুরাগী। যাগযজ্ঞাদির জন্য কিছু বিশেষ যোগ্যতার দরকার হয়, কিন্তু ভক্তিপথে অনুরাগ ব্যতীত অন্য কোন যোগ্যতার অপেক্ষা রাখে না। এ পথে অত্যুন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারি হওয়া আবশ্যিক নয়, অতি সাধারণ মানুষও এই পথ অনুসরণ করতে পারেন। ভোগসুখের ইচ্ছাও যদি থাকে, কিন্তু সেই ইচ্ছা যদি অত্যন্ত তীব্র হয়ে সাধককে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে না রাখে, তাহলে সেটাও বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। এই-ই হলো এই পথের যোগ্যতা বা অধিকার।

ভাগবতে প্রশ্ন করা হয়েছে, কে ভক্তিযোগী? উত্তরে বলা হচ্ছে, যার শ্রীভগবানের লীলার প্রতি আকর্ষণ আছে, অনুরাগ আছে ভক্তিযোগ তারই সহায়ক। ভগবানের কথা শুনতে শুনতে যেভাবেই হোক তাঁর প্রতি

তার আগ্রহ জন্মেছে, একটা আকর্ষণবোধ এসেছে। সে ব্যক্তির অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্তি আছে তাও না, আবার তীব্র ত্যাগ-বৈরাগ্যের আকাঙ্ক্ষা আছে তা-ও না। সে যেন মধ্যপথে রয়েছে। 'নাতিসক্তঃ নাতিনির্বিন্নঃ' সেক্ষেত্রে তার একটিমাত্র যোগ্যতাই বিবেচ্য যে তার ভক্তিপথে যাবার আগ্রহ আন্তরিক কিনা। যদি তা হয়, কেবলমাত্র মুখের কথা না হয় তবে এপথ নিঃসন্দেহে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এতক্ষণ যা বললাম, তাতে এটা স্পষ্ট যে আত্যন্তিক ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন ব্যক্তির মনে স্বভাবতই ভগবানের কথা শুনবার জন্য কোন আগ্রহই জাগতে পারে না। আবার যদি কেউ এতদূর পবিত্র হয় যে সর্বতোভাবে সকল সুখভোগে বীতস্পৃহ তবে তার পক্ষে জ্ঞানযোগ বা অন্য কোন পথ অবলম্বন করা সম্ভব। অবশ্য ভক্তির পথও সে অবলম্বন করতে পারে কিন্তু অন্য পথও তার কাছে অবারিত বলে সে যে বিশেষভাবে এই পথেরই জন্য চিহ্নিত তা নয়। কিন্তু যিনি অতদূর পবিত্র নন যে সকল কামনা-বাসনার ঊর্ধ্বে বা যিনি সেই পরম সত্যকে জানবার জন্য সমগ্র মনপ্রাণ এখনও নিয়োগ করতে পারেননি, তাঁর ভক্তিযোগই প্রশস্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যার সেই ব্যাকুলতা জেগেছে সে তো ভক্তিলাভ করেইছে—তার আর ভক্তিযোগ আলোচনার কি প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে প্রয়োজন এইজন্যই যে সেই ব্যাকুলতা, আর্তি যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয়, ভুল পথে গিয়ে তা যেন অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়। দ্বিতীয়ত, সাধকের মনে লক্ষ্য সম্বন্ধে যেন কোন ভ্রান্তি বা সংশয় না থাকে। কোন্ পথ ধরে সে অগ্রসর হবে, কি কি ধরনের বাধাবিঘ্ন আসতে পারে এবং লক্ষ্যবস্তু কি এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণার জন্যই ভক্তিযোগ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

কারও জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্তির জন্যই ভক্তিযোগ নয়। এই যোগ আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত। একে লঘুভাবে দেখা বা নিছক আলোচনার বস্তু বলে গ্রহণ করা অনুচিত। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ, একজন দার্শনিক, যিনি শাস্ত্রীয় কৌতূহল নিবৃত্তি ও জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্য বহু গ্রন্থপাঠ করেন কিন্তু সেই অধীত জ্ঞানের সঙ্গে তাঁর কোন যোগই থাকে না। তাঁর পুঁথিগত দর্শন একরকম আর তাঁর জীবনযাত্রা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। উচ্চমার্গের দর্শনচর্চা করেন বলে তাঁর জীবনও যে তদনুযায়ী হবে তা নয়। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক অনেক গভীর তত্ত্বকথা বলে থাকেন, কিন্তু তিনি যে নিজের জীবনে সেই তত্ত্বকে মেনে চলবেন এর কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ছাত্রজীবনে এইরকম একজন অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছিলাম বলেই একথা বিশেষভাবে জানি। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, তিনি অনেক জটিল বিমূর্ত বিষয়ের আলোচনা অতি চমৎকারভাবে করতেন এবং অধ্যাপক হিসাবেও যশস্বী ছিলেন। কিন্তু অধীত শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁর নিজ জীবনে প্রতিফলিত হওয়া তো দূরের কথা, সাধারণের থেকেও অনেক নিম্ন ছিল তাঁর জীবনযাত্রার মান। তাঁর খ্যাতি ছিল, কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর জীবনের মেলবন্ধন হয়নি।

সেইজন্যই দেবর্ষি নারদ অধিকারি সম্বন্ধে সচেতন করে বলছেন এই ধরনের ব্যক্তির জন্য ভক্তিযোগ নয়। যাঁরা এই বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অধিগ্রহণ করে সেই জীবনকে রূপান্তরিত করতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যেই তাঁর এই ভক্তিশাস্ত্র।

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিষয় ও অধিকারি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এবার আসি শাস্ত্রপাঠের প্রয়োজনীয়তা কি সেই তৃতীয় বিষয়ে।

এই শাস্ত্রের অনুধ্যানে লাভ হবে পরমা ভক্তি। এই ভক্তিই সাধ্য বা উদ্দেশ্য। চতুর্থ বিষয় হলো সম্বন্ধ। ভক্তিলাভ যিনি করতে চান কেবল মাত্র পথ আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবধানই যথেষ্ট নয়, পরমাভক্তিলাভই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। শুধুই গ্রন্থ পাঠ করে তাঁর ভক্তি হবে না। ভক্তিমার্গ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তাঁকে সাধন করতে হবে। জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্মতা অনুভবই লক্ষ্য এবং বিবেকবিচারই প্রধান সাধন বা লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ। জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির দ্বারা কিছুদূর হয়তো এগোন যায়। কিন্তু ভক্তিপথে কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে এতটুকুও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। ভক্তিলাভের প্রয়াসই এখানে বড়কথা, ভক্তিই এখানে সাধ্য ও সাধন দুই-ই। তাই ভাগবত বলছেন, 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্' (১১।৩।৩১)। ভক্তিসাধনের দ্বারাই পরমাভক্তির ভূমিতে উপনীত হতে হবে। অর্থাৎ বৈধী ভক্তির পথ ধরেই প্রবর্তক সাধককে পৌঁছতে হবে ভক্তির পরাকাষ্ঠাতে বা পরমপ্রেমে। কিন্তু পরমপ্রেম তো পরিণতি। তার আগে যাত্রার প্রারম্ভে ভক্তির একটু আভাস না পেলে তো যাত্রা শুরু করা যায় না। [লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এই যে পথের সঙ্কেত, এটিই উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ।] এই ভক্তির প্রেরণাই পথের শেষে পরমপ্রেমে পরিণতি লাভ করবে।

সা ত্বস্মিন্ পরম প্রেমরূপা ।। ২ ।।

অন্বয় ঃ সা (সেই ভক্তি) তু (কিন্তু) অস্মিন্ (ইহার প্রতি অর্থাৎ পরমেশ্বরের প্রতি) পরম প্রেমরূপা (প্রেমের পরাকাষ্ঠা)।

অর্থ ঃ ভগবানের প্রতি অপরিসীম ভালবাসাই হচ্ছে ভক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তির স্বরূপ অবর্ণনীয়, তবু ভাষায় তা যতটা প্রকাশ করা সম্ভব তারই সংক্ষিপ্ততম সংজ্ঞা দেবর্ষি এখানে দিয়েছেন—ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমই ভক্তি।

কিন্তু সংজ্ঞাটি সংক্ষিপ্ততম হলে কি হয়, এর ব্যঞ্জনা অতি নিগূঢ়। প্রথমেই বলা হচ্ছে এই প্রেম হবে পরম। 'পরম' এই বিশেষণটিই তথাকথিত সাধারণ ভালবাসার সঙ্গে এর এক বিরাট পার্থক্য সূচনা করছে। 'পরম' শব্দটি শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগতও। এ ভালবাসা কেবল তীব্র বা গভীর নয়, সাধারণ লৌকিক ভালবাসা থেকে এর গুণগত মান ভিন্ন। কি সেই পার্থক্য? ভালবাসার গুণগত শ্রেণীভেদ কি করে হয়? উদাহরণস্বরূপ জাগতিক ভালবাসার কথা বলা যায়। সেখানে তো কত প্রকারভেদই দেখি। সন্তানের প্রতি জননীর ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, পিতা-মাতার প্রতি, আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি ভালবাসা কিংবা নাম-যশ-অর্থের প্রতি আকর্ষণ। এ সবই ভালবাসা, কিন্তু এর কোনটিকেই 'পরম' বলা যাবে না।

তাহলে কোন্ বিশেষ গুণটি এই সাধারণ ভালবাসাকে অসাধারণ করে তোলে? 'পরম' করে তোলে? সেটি হচ্ছে শুদ্ধ অহৈতুকী ভালবাসা। সেই পরম প্রেম ব্যতীত অন্য সব ভালবাসাই আত্মকেন্দ্রিক বা স্পষ্টভাষায় বলা যায় স্বার্থগন্ধযুক্ত ভালবাসা। হয়তো একথায় অনেকেই আপত্তি করতে পারেন। তাঁরা সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য বা স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসাকে বলবেন নিঃস্বার্থ ভালবাসার উদাহরণ। জগতে এ ধরনের ভালবাসা দুর্লভ হলেও একেবারে নেই তা নয়, এই তাঁদের মত। কিন্তু আমরা বলব, না। অন্তরের গভীরে সেখানেও এক

স্বার্থবুদ্ধিই কাজ করে। কেন? না, ভালবাসার পাত্রটিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের এ ভালবাসা বিকীর্ণ হচ্ছে। মা শিশুকে ভালবাসছেন শিশু বলেই নয়, বাসছেন তাঁরই শিশুসন্তান বলে! সুতরাং তাঁর ভালবাসাটি নিজেকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত। এইভাবে সর্বত্রই দেখা যায় আপাত নিঃস্বার্থ সমস্ত ভালবাসারই কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটা সূক্ষ্ম স্বার্থবোধ। সব ব্যাপারেই এসে পড়ছে 'অহং', আমি, আমাকে বা আমার বোধ। এমনকি একটি শিশুও যে একটা পুতুল ভালবাসে তার কারণ সে জানে এটা তার 'নিজের' পুতুল। এই রকম সব ভালবাসার ক্ষেত্রেই জড়িত আছে 'আমার' অধিকারবোধ। সেইজন্যই একে বলা হয় স্বার্থপর ভালবাসা। একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাতেই কোন স্বার্থের সম্বন্ধ থাকে না। তাঁকে যখন ভালবাসি তখন একবারও মনে হবে না যে তিনি একমাত্র আমারই দেবতা, অন্য কারও নন। তাঁকে ভালবাসি তাঁকে ভালবাসা যায় বলেই। সুতরাং কোন অধিকারবোধ সেখানে কাজ করে না। তাঁকে ভালবাসার সময়ে কখনও মনে হবে না যে তিনিই আমার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। তিনিই একমাত্র পরম প্রেমের বস্তু বলেই তাঁকে আমাদের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিতে পারি। সেইজন্যই উপনিষদ্ বলছেন, ''ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।'' (বৃহঃ উঃ, ২।৪।৫)

ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রিয় কেন? তিনি ঈশ্বর বলেই। এর সঙ্গে অন্য কোন স্বার্থকেন্দ্রিক সম্বন্ধ নেই বলেই। এই নিঃস্বার্থতার জন্যই এই প্রেম পরম, গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই। পরিমাণগত এইজন্য যে অন্য কোন পার্থিব ভালবাসা এত তীব্র হয় না, যা নিজের অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দিতে পারে।

সেদিক দিয়ে সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসাকেও কি আমরা নিঃস্বার্থ বলতে পারি না। হ্যাঁ, পারি কতকটা পরিমাণে। হয়তো সমস্ত পার্থিব সম্পর্কের মধ্যে নিঃস্বার্থ ভালবাসার এটি কথঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। যখন শিশু খুবই ছোট্ট থাকে, অন্তত সেই সময়টা তার কাছে মায়ের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কিন্তু যতই সে বড় হতে থাকে, সমাজ সংসারের সে একজন সদস্য হয়ে ওঠে, তখন মা-ও কিছু প্রতিদান আশা করেন। তবু সেক্ষেত্রেও এ ভালবাসাকে আমরা সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন বলতে পারি না কারণ সেই আমিত্ববোধ, অধিকারবোধ সেখানে নিভৃতে কাজ করে। এ সন্তান তাঁর সন্তান এই বুদ্ধিই তাঁর ভালবাসার মূলে। অন্যভাবে বলা যায় শিশু তো মায়েরই প্রতিরূপ, তাই তাকে ভালবাসা নিজেকে ভালবাসারই এক রূপান্তরমাত্র। তিনি নিজেকে ভালবাসেন তাই সন্তানটিকেও ভালবাসেন, সেজন্য সেটি হয়ে যায় স্বার্থযুক্ত। জগতের সমস্ত সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এই একই নীতি বা স্বার্থ কাজ করছে, ভালবাসার সঙ্গে মিশে আছে আত্মরতি। কথাটা হয়তো শুনতে রূঢ় বা কঠিন, অনেকেই শুনে বিচলিত বা হতাশ হবেন, কিন্তু গভীর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য।

সংশয় জাগতে পারে এই পার্থিব ভালবাসার সঙ্গে দিব্যপ্রেমের কি কোন সাদৃশ্য আছে? উত্তরটা নেতিবাচক। কারণ ভগবানের জন্য যে ভালবাসা তাতে কোন অধিকারবোধ, আমি বা আমার বোধ নেই, কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই। এই দিব্য প্রেমের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত বৃন্দাবনের গোপীদের জীবন। সেখানে কি দেখি? সেখানেও প্রথমে মনে হয় যেন তাঁদের 'আমার কৃষ্ণ' এই বোধ কাজ করছে। হয়তো সে বোধ আছে, কিন্তু তাঁরা তাঁদের ভালবাসার পাত্রকে একান্ত নিজের করে রাখেননি। জানতেন

ভগবান কেবল তাঁদের একার নন, তিনি সকলের। কৃষ্ণকে কেবলমাত্র নিজের বলেই ধরে রাখছেন, এ মূঢ়তা তাদের ছিল না। ছিল তাঁকে 'আমারই' বলে সম্বোধন করবার একটা মাধুর্যের আবরণ মাত্র। এই আমার বোধ আত্মরতি নয়, 'অহং' বোধ নয় কেননা এখানে সকলেই জানে যে ভগবান কারও একার প্রেমাস্পদ নন।

তাহলে এটাই কি সত্যি যে সব রকমের জাগতিক ভালবাসাই স্বার্থকেন্দ্রিক? যদি তাই হয় তবে জাগতিক ভালবাসাকে আমরা কোন উচ্চমূল্য দিতে পারি না। একথা একদিক থেকে ঠিকই যে জাগতিক ভালবাসা যদি নিঃস্বার্থ হয় তবে তাকে ভালবাসা আখ্যাই দেওয়া যায় না। যদি কাউকে একান্তই আমার বলে না-ই ভাবি, তবে ভালবাসা মুখের কথা মাত্র। সেখানে কোন মমত্ববোধ, কোন গভীরতা থাকে না। ভালবাসা যত গভীরতর হবে ভালবাসার পাত্র তত আপনতর হয়ে উঠবে। এটা খুব খাঁটি কথা, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে আমরা এর উপরের সূক্ষ্ম আবরণটি সরিয়ে দেখতে পাচ্ছি না। এই আবরণ বা মায়ার জালটি থাকার জন্যই আমরা এই লৌকিক ভালবাসাকেও মহৎ, শুদ্ধ, দিব্য কত কি বলে থাকি। কিন্তু তলিয়ে বুঝতে কি কখন চেষ্টা করি? করলে দেখব এক সঙ্কীর্ণ 'মমত্ব' বোধ ছাড়া পার্থিব ভালবাসার অস্তিত্বই থাকতে পারে না।

এর থেকে আমরা একটা অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছই যে মা তাঁর সন্তানকে ভালবাসেন সন্তানের জন্যই নয়, সন্তানকে ভালবেসে তিনি সুখ পান তাই। স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা বা অন্য যে কোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রযোজ্য। তাহলে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে কি হয়? তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রেও তো আমরা তাঁকে ভালবাসি তাঁর জন্য নয়, নিজেরই আনন্দের জন্য। না, সেকথা বলা যায় না এইজন্য যে সে সময় আমরা

নিজেদের কথা মোটেই ভাবি না। আমরা যখন তাঁকে আমাদের প্রেম নিবেদন করি তখন একবারও মনে হয় না যে তিনি বিনিময়ে কিছু দিয়ে আমাদের খুশি করবেন। ঈশ্বর স্বয়ং প্রেমস্বরূপ তাই তাঁকে ভালবাসার ক্ষেত্রে দৈবীভাবের একটা সংস্পর্শ সব সময়েই থেকে যায়। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলে আমরা বুঝতে পারব তিনিই একমাত্র ভালবাসার বস্তু। তিনি প্রেমস্বরূপ বলেই আমাদের কাছে তিনি প্রিয়তম, একমাত্র প্রেমাস্পদ। তিনি প্রিয়, কেননা তিনি প্রীতিময়।

আরও একটা বিষয় আছে যা নিয়ে পরে আলোচনা করব তা হচ্ছে তাঁর মহত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা হয়তো শাস্ত্র পড়েননি, ভক্তিপথের বিষয় কিছুই জানেন না বা ঈশ্বরপ্রেম কথাটির সঙ্গে পরিচিত নন, কিন্তু তাঁরাও তাঁদের ভালবাসার পাত্রটির কোন বিশেষ গুণ আছে একথাটা মনে মনে জানেন। তাই তাঁরাও যখন ঈশ্বরকে ভালবাসেন এটা বুঝতে পারেন যে জগতের অন্য সব বস্তু থেকে ঈশ্বরের কোথাও একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। এই বোধ, এই চেতনাই লৌকিক প্রেম থেকে দিব্য প্রেমকে পৃথক করে।

কথাটা আরও একভাবে বলা যায়। নিজের জন্যই কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালবাসি একথা সত্যি হলে ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই বা তা প্রযোজ্য হবে না কেন? আমি আমার দেহকে ভালবাসি। কেন? না, এটা আমার দেহ। তাই একটা কিছুর জন্যই ভালবাসা। দেহ অসুস্থ হোক সেটা আমি চাই না, কেন না তা আমার কাছে প্রীতিপ্রদ নয়। সুতরাং দেহ নয়, ভাললাগা বা ভালবাসা সবই এই আমাকে কেন্দ্র করে। এই যে দেহের থেকে নিজেকে পৃথক করছি এর অর্থ কি? নিজেকে যখনই দেহ-মন-বুদ্ধি বলে জানছি, শুদ্ধ আত্মা বলে জানছি না, তখন আর এ ভালবাসা শুদ্ধ থাকছে

না। আরও একটু গভীরে গিয়ে বলা যায়, এ দেহ আমার বলেই যে দেহটাকে ভালবাসছি তা নয়, আমি নিজেকেই ভালবাসছি। দেহকে ভালবাসি, কারণ তার মধ্য দিয়েই আনন্দ অনুভব করছি। দেহই হচ্ছে সেই যন্ত্র যার মাধ্যমে ঘটে আমার ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি। মন, ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে এই একই সূত্র প্রযোজ্য। অর্থাৎ আমার 'আমি'-কেই আমি ভালবাসছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সেই আমি বা সেই আত্মার সঙ্গে যুক্ত বলেই অন্য যা কিছু বস্তু তা আমার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে।

ঈশ্বর হচ্ছেন সেই আত্মস্বরূপ—আমাদের সকলের আত্মা। সুতরাং নিজেকে ভালবাসা আর ভগবানকে ভালবাসা হতে পারত সমার্থক। যখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদি অনাত্মবস্তুকে আমরা আত্মা বলে ভ্রম করি ও তার প্রতি আসক্ত হই, এই নিজেকে ভালবাসা তখন হয়ে পড়ে অশুদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ। ঈশ্বরপ্রেম দিব্য ও পবিত্র আর দ্বিতীয়টি মালিন্য ও দোষযুক্ত। কিন্তু আত্মাই ঈশ্বর এই বোধ থাকলে সে ভালবাসাই তখন শুদ্ধ প্রেম।

লৌকিক প্রেম ও ঈশ্বরপ্রেমের এই তুলনামূলক আলোচনার সার সংক্ষেপ এই যে, ভক্তি হলো ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমস্বরূপ। ভক্তির সংজ্ঞায় পরম প্রেম না বলে পরমপ্রেমরূপা কেন বলছেন? বলছেন এইজন্য যে পরম প্রেমকে মৌখিক ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কেন যায় না? না, যা সম্পূর্ণ মৌলিক তা বর্ণনার অতীত। আমরা প্রগাঢ় ভালবাসা বুঝলেও পরম প্রেম কাকে বলে জানি না, ওটি আমাদের অনুভূতির বাইরে। তাই বলছেন, ভক্তি হলো পরম প্রেমের মতো বা পরম প্রেমের স্বরূপ। এর বেশি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তীব্র ভালবাসার মধ্যে এই পরমপ্রেমের আভাসই মেলে মাত্র, কিন্তু দুটি এক নয়। প্রথমটি লৌকিক সুতরাং অশুদ্ধ আর দ্বিতীয়টি শুদ্ধ। জাগতিক প্রেমের

মাপকাঠিতে শুদ্ধ প্রেমের ধারণা করা অসম্ভব বলেই ঋষি পরমপ্রেমকেই ভক্তি না বলে বলছেন, ভক্তি পরম প্রেমের স্বরূপ। প্রেম সম্বন্ধে আমাদের সীমিত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে এই পরম প্রেম—ভক্তি তারই রূপ বিশেষ।

'পরম' শব্দটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম, তবু আরও একটি কথা এখানে বলবার আছে। এই প্রেম ঈশ্বরে অর্পিত হলে তবেই তা হবে ভক্তি। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর প্রতি প্রবল অনুরাগ কিন্তু ভক্তি নয়, সেটি আসক্তি, সেটি আকর্ষণ মাত্র। ঈশ্বরই ভক্তির একমাত্র আস্পদ। যখন আমরা গুরুর প্রতি বা অন্য কোন মহাপুরুষের প্রতি ভক্তির কথা বলি তা হলো ঈশ্বরেরই আর একটা বিশেষ রূপের প্রতি ভক্তি। কারণ গুরুকে বা প্রকৃত কোন মহাত্মাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সদা যুক্ত বা অভিন্ন বলেই তখন মনে করি। সুতরাং ঈশ্বর এবং একমাত্র ঈশ্বরই আমাদের ভক্তির আধার, তাঁর প্রতি ভালবাসার পরাকাষ্ঠাই ভক্তি। একমুখী অবিচলিত তীব্রতম অনুরাগই ভক্তি। ভক্তির দ্বিতীয় পাত্র নেই—একজনই আছেন, তিনি ঈশ্বর—একমাত্র ঈশ্বর।

তবে কি আমরা এ জগতে অন্য কাউকে ভালবাসব না? তা কখনই বলব না। আমরা ভাল সবাইকেই বাসব, কিন্তু তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ হবে ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে। ঈশ্বরই তাদের হৃদয়ে অবস্থিত—তারা ঈশ্বরেরই প্রতিনিধি এই বোধ জাগ্রত থাকবে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবান ছাড়া অন্য আর কিছুর স্থান নেই। ইহুদী শাস্ত্রে ঈশ্বরকে বলা হয়েছে jealous বা ঈর্ষাপরায়ণ। এর অর্থ হৃদয়মন্দিরে তিনি ছাড়া আর কারও স্থান নেই। আর সমগ্র হৃদয় জুড়ে যদি তিনিই থাকেন, অন্য কোন বস্তুর সেখানে স্থান কোথায়? এইভাবে একমাত্র তিনিই যখন হৃদয়েশ্বর হয়ে থাকবেন সেই অবস্থাতে বলা চলে ভক্তির উন্মেষ ঘটেছে।

ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে এর মধ্যে কোন স্বার্থবুদ্ধি জড়িত থাকা চলবে না। কোন কিছু পাবার জন্য তাঁকে আরাধনা করা নয়। তিনি 'তিনি' বলেই, ঈশ্বর বলেই তাঁকে ভালবাসি। অন্য কিছুর জন্য নয়, তাঁর জন্য তাঁকে চাওয়া—লৌকিক কোন প্রত্যাশা, এমনকি সুখের জন্যও নয়। শুধু তাঁকে পাওয়াই একমাত্র চাওয়া। নাম-যশ-ধন-সম্পদ অন্য কোন কিছুই তাঁর অনুগ্রহে পাবার আশা করব না। আর সেজন্য প্রয়োজন হলে দুঃখকেও সাদরে বরণ করে নিতে হবে। যদি তার জন্য কোন অসন্তোষের সৃষ্টি হয় তো তাও বরণীয়। আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার পেছনে তিনি যে আমাদের কিছু দেবেন এ রকম কোন কারণ থাকবে না। ন্যূনতম চাওয়াও নয়। এপথে চলতে চলতে সুখ-শান্তি-আনন্দ হয়তো অনেক কিছুই আপনা থেকেই আসতে পারে, কিন্তু আমাদের যেন তার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা না থাকে। এমনকি মোক্ষের কথা, জন্ম-মৃত্যুর পারে যাবার কথাও আমাদের ভাবনায় থাকবে না। যেখানে গভীর ভালবাসা মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও সেখানে অবান্তর।

তাই যদি হয়, কিছু যদি না পাবারই থাকে, তবে তাঁকে আমরা ভালবাসব কেন? প্রশ্নকর্তার এ প্রশ্নটা তাঁকেই ফিরিয়ে দিয়ে বলতে পারি, আমরা নিজেদের কেন ভালবাসি? ভাল না বেসে যে আমরা পারি না, ওটা স্বতই উৎসারিত হয়। ভক্তের ক্ষেত্রেও একই উত্তর। তিনি ঈশ্বরকে যে না ভালবেসে পারেন না। ঈশ্বরই যে তাঁর একমাত্র ভালবাসার পাত্র। ঈশ্বর তাঁকে ভালবাসবেন এই প্রত্যাশায় ভক্ত ভগবানকে ভালবাসেন না। ভক্তের নিজেকে উজাড় করে দেওয়াতেই আনন্দ, পাবার কোন আকুলতা নেই। অমরত্বলাভ, ভববন্ধন থেকে মুক্তি এসব প্রত্যাশা ভক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সন্দেহ নেই, কিন্তু এগুলি ভক্তির নিম্নস্তরের কথা। শুদ্ধাভক্তির সংজ্ঞায় এইসব কামনা-বাসনার স্থান নেই, নেই সামান্যতম প্রত্যাশা।

শেষ প্রশ্ন, এই অপার্থিব প্রেম কি আমাদের পক্ষে সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব যদিও অধিকারির সংখ্যা হয়তো মুষ্টিমেয়। ভক্তির এই পরাকাষ্ঠায় উন্নীত হতে পারেন অতি দুর্লভ ভাগ্যবান কোন কোন ভক্ত। কিন্তু যে যেখানে আছেন সেখান থেকে যাত্রা শুরু করার তো কোন বাধা নেই। প্রথমদিকে হয়তো স্বার্থবুদ্ধিও থাকতে পারে, তাতেও ক্ষতি নেই। এই পথ ধরে নিষ্ঠাভরে চলতে চলতে তাও ধীরে ধীরে অপসারিত হবে, আমরা উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠব ও ভক্তির সংজ্ঞায় যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে সেই লক্ষ্যে একদিন পৌঁছব।

অমৃতস্বরূপা চ ॥ ৩ ॥

অন্বয় ঃ (সা-সেই ভক্তি) অমৃতস্বরূপা (অমরণধর্মা-অপরিবর্তনীয়া) চ (উপরন্তু)।

অর্থ ঃ এই ভক্তি অমৃতস্বরূপা, অবিনাশী অর্থাৎ পার্থিব ভালবাসার মতো পরিবর্তনীয় নয়, অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর।

ব্যাখ্যা ঃ আমরা দুটি সূত্র আলোচনা করেছি। প্রথমটি ছিল বিষয়বস্তুর পরিচিতি, উপক্রমণিকা, দ্বিতীয়টি ভক্তির সংজ্ঞা নির্ণায়ক। এই সংজ্ঞা প্রসঙ্গেই তৃতীয় সূত্রে ভক্তির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। আগে বলা হয়েছে ভক্তি প্রেমের পরাকাষ্ঠা, ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেমস্বরূপা। এখানে বলছেন, এই ভক্তি হচ্ছে এমনই প্রেম যার ক্ষয় নেই, বিনাশও নেই, যা অমৃতস্বরূপা।

প্রেম শব্দটির ব্যঞ্জনা অতি ব্যাপক। আমরা সাধারণভাবে প্রেমের অর্থ একরকম ভাবে বুঝি, কিন্তু যাঁরা সেই দিব্যপ্রেম অনুভব করেছেন তাঁদের কাছে প্রেমের সংজ্ঞা অন্য। একই শব্দ কিন্তু তার তাৎপর্য একেবারে ভিন্ন। কেন ভিন্ন? কারণ, সে দিব্য প্রেম আমাদের অনুভূতির অগোচর। দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপভোগেই আমাদের প্রেম সীমাবদ্ধ কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াতীত বলে দিব্য প্রেম এক অনন্য আস্বাদন। দুটি প্রেমের ধর্ম ভিন্ন হলেও একই শব্দ ব্যবহার করা ভিন্ন আমাদের অন্য উপায় নেই, নেই এর অন্য কোন প্রতিশব্দ।

দিব্যপ্রেমে যে আনন্দানুভূতির প্রকাশ সাধারণ পার্থিব প্রেমের বাহ্য প্রকাশও অনেকটা তারই অনুরূপ। বলা চলে এও সেই পরম প্রেমেরই এক বিভঙ্গ, কিন্তু দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অতলান্ত। সেইজন্য এই পৃথকীকরণের প্রয়াসেই বলা হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তা হলো অমৃতস্বরূপ।

ভক্তি কেবল পরম প্রেম নয়, অমৃতপ্রেম। এ প্রেম অমর্ত ও অমর অর্থাৎ এ প্রেমের শেষ নেই। পার্থিব প্রেমের আদি ও অন্ত আছে, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম একবার হলে তার বিরতিও নেই, শেষও নেই। জাগতিক ভালবাসায় প্রতিনিয়ত সচেতনতা থাকতে পারে না বা তা নির্বাধও হয় না, হওয়া সম্ভবও নয়। কেন না এখানে যে ভালবাসছে এবং যাকে ভালবাসছে দুজনেই দেশকাল পাত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে অবস্থিত। তাই এ প্রেম ক্ষণিক। আমাদের অনুভবগম্য প্রেমের সঙ্গে দিব্য প্রেমের এখানেই মস্ত বড় পার্থক্য। এ প্রেম কখনও অসীম হতে পারে না কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত তাঁর প্রতি প্রেমেরও সীমা পরিসীমা নেই। তীব্রতা, স্থায়িত্ব ও গুণগত মান

সবদিক থেকেই এ প্রেম দিব্য প্রেম। জাগতিক যে প্রেমের স্বরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই শুদ্ধ প্রেম বা শুদ্ধা ভক্তি কোন বহিরঙ্গ পরিবেশের উপর নির্ভরশীল নয়। জগতে আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্পর্শে এলে তখন আমাদের প্রেম বা ভালবাসা জাগে, কামনার উদ্ভব হয় কিন্তু দিব্যপ্রেমে কোন বহিরাগত বস্তুর অপেক্ষা নেই, কারণ সে ভালবাসাও আমার অন্তরের বস্তু আর যাঁকে ভালবাসছি সেই প্রেমাস্পদের অধিষ্ঠান অন্তরেই। এ প্রেমে আস্বাদক ও আস্বাদ্য পৃথক নয়। প্রেমের পাত্র প্রেমিকের সঙ্গে অভিন্ন। আমরা বলি ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, কিন্তু সেই ঈশ্বর তো আমার বাইরে নন, তিনি যে আমারই অন্তরতম সত্তা।

ভক্ত সেই পুরুষোত্তম থেকে কখনও নিজেকে ভিন্ন মনে করেন না। তাঁর একটা দ্বৈত অনুভূতি থাকে, কিন্তু দ্বৈত বলতে আমরা জাগতিক বুদ্ধিতে যা বুঝি তা ঠিক সে ধরনের নয়। এখানে ভালবাসার পাত্র অসীম অনন্ত শাশ্বত পুরুষ আর তাঁর প্রতি প্রেমও অসীম। সেইজন্য একে পরমপ্রেম বলা হয়েছে। এই পরম প্রেমের অন্ত হয় না বলেই তা অমৃতস্বরূপ হতে বাধ্য। এখানে 'চ' শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা ঋষি বোঝাতে চাইছেন যে এটি পূর্বতন সূত্রেরই অনুষঙ্গ, পৃথক কোন সংজ্ঞা নয়।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখলাম কেন ঈশ্বরের প্রতি প্রেমকে পরম প্রেমস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপ বলা হয়েছে। একে পরম প্রেম না বলে পরম প্রেমের স্বরূপ বলা হয়েছে। যদি পরমপ্রেম বলা হতো তাহলে যে জাগতিক প্রেমের সঙ্গে আমরা পরিচিত তাকেই বোঝাত। কিন্তু 'স্বরূপ' কথাটির প্রয়োগের দ্বারা ইঙ্গিত করা হলো যে আমাদের পরিচিত

যে প্রেমানুভব সেটি এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ নেওয়া হয়েছে। আমাদের জাগতিক ভালবাসা আর ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ঠিক এক নয়, একটা সাদৃশ্য আছে এই মাত্র। বৈসাদৃশ্য অনেক আছে সেগুলি ক্রমশ আলোচনা করব। এখন কেবলমাত্র এটাই বুঝবার যে পার্থিব সম্পর্কে যে সব ক্ষেত্রে মহত্তম অনুভূতি হয়, দিব্যপ্রেম তার স্বরূপ হলেও তাকে ছাপিয়ে যায়। প্রথমে এই জগতে সাধারণভাবে প্রেম বলতে কি বোঝায় ও তারপর সেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে তা বলা হলো। তারপর বলছেন, এ প্রেম তার সদৃশমাত্র, কিন্তু এক বস্তু নয় এবং শেষকালে বলছেন, এ প্রেমের লক্ষ্যবস্তু ঈশ্বর।

এইভাবে ভক্তির সংজ্ঞাটির প্রথমার্ধে ভক্তি কি সে কথা বলে দ্বিতীয়ার্ধে অপর বৈশিষ্ট্য বলছেন অমৃতস্বরূপত্ব। জগতের যে কোন ভালবাসাতেই একদিন ছেদ পড়বেই। ভালবাসায় হয় ভালবাসার ব্যক্তি বা বস্তু চলে যায় নয়তো যিনি ভালবাসেন তিনি থাকেন না। প্রেমিক বা প্রেমাস্পদ একজনের জীবনাবসান হয়। অথবা প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে যার ফলে উভয়ের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়। তাই তিনটি কারণের যুগপৎ সমাবেশ ঘটলে তবেই প্রেম অমর হতে পারে। প্রথমত, ভালবাসার পাত্র যেখানে অমর বা অব্যয়—এখানে স্বয়ং পরমেশ্বর। দ্বিতীয়ত, যিনি ভালবাসছেন সেই আমি বা ভক্ত—তিনিও অমর, নিত্য, কারণ তিনি ভগবানেরই অংশ। এবং তৃতীয়ত, এই ভালবাসা কোন বহির্বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, যার ফলে ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্কে কোন বাধা বা বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকে না। তাই এই ভক্তি অমৃতস্বরূপা। এখানে প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদ তিনটিই নিত্য।

জাগতিক প্রেমের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রেমের অনেক সাদৃশ্য আছে। সাদৃশ্য আছে সুখ, আনন্দ বা উল্লাসবোধে। কিন্তু বৈসাদৃশ্যও অনেক। প্রথমত, পার্থিব প্রেম ক্ষণস্থায়ী, বিনাশশীল। দ্বিতীয়ত, এ প্রেম যত সুগভীরই হোক, সেই ভূমিতে কখনই পৌঁছতে পারে না যেখানে প্রেমিক নিজেকেও ভুলে যায় এবং তৃতীয়ত, এই ভালবাসা নশ্বর বস্তুর প্রতি, কোন নিত্য বস্তু সম্বন্ধে নয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে এই তিনটি অবগুণের একটিও নেই। এই জন্যই তা দিব্যপ্রেম এবং তাই ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে—ভক্তি হলো ঈশ্বরের প্রতি প্রেমস্বরূপা ও অমৃতস্বরূপা।

আমরা প্রায়ই শুনি, আমাদের সাধারণ ভালবাসাকে মোড় ঘুরিয়ে যদি ঈশ্বরে দিই, তবে তা-ই হবে দিব্যপ্রেম, সেটিই ভক্তি। কিন্তু কথাটা ঠিক তা নয়। কারণ মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া কথাটার মধ্যে রয়েছে একটা প্রয়াসের ব্যঞ্জনা, আমাদের সচেষ্টতা। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ সে তো স্বতঃস্ফূর্ত, তা অপরের কোন নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। সে তো আমাদের প্রাণের বস্তু, আমার অস্তিত্বেরই অংশ। এই বিষয়টি অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভক্তির অর্থ এ নয় যে আমরা চেষ্টা করে তাঁর দিকে মন দেব। একেবারে প্রবর্তক অবস্থায় ভক্তির প্রাথমিক স্তরে একথা সত্যি হতে পারে কিন্তু ভক্তি যখন পরিণত হয় তখন তা বিধিনিষেধের অতীত। মনের গতিকে তখন নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন থাকে না, মন সর্বক্ষণের জন্যই ঈশ্বরে স্থিত থাকে। ভক্তিই ভক্তের সত্তা। তখন ভগবান-ভক্ত-ভক্তি এক অঙ্গে মিলে যায়। এই-ই হলো প্রকৃত ভক্তির তাৎপর্য।

তাহলে প্রকৃত ভক্তি লাভ হলো কিনা কিভাবে তা জানা যাবে? পরবর্তী সূত্রে সেই কথাই বলেছেন, যে ভক্তি লাভ হলে জীব সিদ্ধ বা পূর্ণ,

অমৃত বা অমর হয় এবং তৃপ্ত, সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট হয়। এই প্রত্যেকটি বিশেষণেরই গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে।

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

অন্বয় ঃ যৎ (যে বস্তু) লব্ধ্বা (লাভ করে, প্রাপ্ত হয়ে) পুমান্ (পুরুষ অর্থাৎ ভক্ত) সিদ্ধঃ (পূর্ণ) ভবতি (হয়) অমৃতঃ ভবতি (অমৃত বা অমর হয়) তৃপ্তঃ ভবতি (পরিতৃপ্ত হয়)।

অর্থ ঃ যে ভক্তি লাভ করে ভক্ত পূর্ণমনস্কাম হয়, তার সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সে অমরত্ব লাভ করে দিব্য হয়, চির পরিতৃপ্ত থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ সর্বপ্রথম লক্ষণ এই ভক্তি লাভ করে মানুষ সিদ্ধ হয়, পূর্ণ হয়। এই সিদ্ধ হওয়ার অর্থ কিন্তু কতকগুলি অলৌকিক বিভূতি লাভ করা নয়। এখানে সিদ্ধির অর্থ অভীপ্সিত লক্ষ্যবস্তুর প্রাপ্তি। এখানে সিদ্ধ হওয়ার অর্থ সে তার প্রার্থিত বস্তু লাভ করেছে। আর সেই প্রার্থিত বস্তু অন্য কিছুই না, শুদ্ধা ভক্তিমাত্র অথবা একমাত্র ভগবান লাভ, অন্য কিছু নয়।

অলৌকিক শক্তিকেও সিদ্ধি বলে এবং সাধন পথে চলতে চলতে সাধকের এইরকম কিছু সিদ্ধি মাঝে মাঝে আপনিই আসে। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের দৃষ্টি কখনও এদিকে যায় না। এই কথাটি বিশেষভাবে খেয়াল রাখা দরকার। কারণ সাধারণ মানুষের মধ্যে এটা প্রচলিত ধারণা যে যিনি ভক্ত

তাঁর কাছে অলৌকিক ক্ষমতা থাকবেই আর যাঁদেরই মধ্যে এই শক্তির প্রকাশ দেখা যায় বা যাঁরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি হন, সাধারণ লোক সর্বদাই তাঁদের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এটা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার এইসব সিদ্ধাই-এর সঙ্গে ভক্তির কোন সম্বন্ধ তো নেই-ই, উপরন্তু অনেক সময় অগ্রগতির পথে এগুলি বাধাই সৃষ্টি করে। এই সিদ্ধাই আর ভক্তির একত্র সমাবেশ হতে পারে না। আর যদি এ সিদ্ধাই কারও মধ্যে আবির্ভূতও হয় কিন্তু সে শক্তির তিনি যদি কখনও প্রয়োগ না করেন, তবে সে শক্তি না থাকারই সমান। প্রকৃত ভক্ত কখনও সচেতনভাবে তাঁর এই সিদ্ধি বা বিভূতি ব্যবহার করেন না। ভক্ত সর্বদা এই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন যেন এইসব বিভূতির প্রয়োগস্পৃহা তাঁকে লক্ষ্যভ্রষ্ট না করে, বিপথগামী না করে। বহু মহাপুরুষদের জীবনে, অবতারদের জীবনে আমরা এইরকম নানা অলৌকিক শক্তির কাহিনী পড়েছি। বিশেষভাবে যীশুখ্রীস্টের জীবনে এইরকম অনেক ঘটনা আমরা বাইবেলে পড়েছি।

অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা দেখি যে একবার এক ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে এসে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে বলে যে, আমরা শুনেছি এখানে একজন পরমহংস থাকেন যিনি নানারকম ওষুধ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উত্তর দেন, না, না, এখানে নয়, অমুক জায়গায় যাও সেখানে এইরকম একজন আছে যে এসব করে। কেন তিনি একথা বললেন? কেন না একজন শুদ্ধাত্মা ব্যক্তির পক্ষে এইরকম ক্ষমতা থাকার চিন্তাও তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হয়েছিল। এই প্রসঙ্গের উল্লেখও তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। বহু সময়েই তিনি বলেছেন, অষ্টসিদ্ধির একটিও যদি কারও থাকে তার সে লক্ষ্য থেকে বহু দূরে পড়ে থাকবে।

তাই যদি হয় তবে যীশু বা অন্যদের জীবনে এইসব অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করার হেতু কি? কারণ এই যে আমরা সাধারণ লোকেরা এইসব ভালবাসি, আমরা এইসব শক্তি লাভ করতে চাই যাতে তার সাহায্যে জাগতিক কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। অসুখ করলে যেমন চিকিৎসকের দ্বারস্থ হই, এও তেমনি। কিছু ঐহিক উন্নতির লোভে সাধুসন্তদের দ্বারস্থ হওয়া। এর সঙ্গে ভক্তির কোন যোগ নেই। শুনেছি একজন সাধু ছিলেন, অন্তত লোকে তাঁকে সাধু বলত, তিনি নাকি বলে দিতে পারতেন কত নম্বরের ঘোড়া রেসে জিতবে। বোম্বাই-এর কাছাকাছি কোথাও তিনি থাকতেন আর তাঁর আশ্রমের সামনে বহু লোকের সমাগম হতো, গাড়ি করেও প্রচুর লোক আসত। সকলের একটাই ইচ্ছা কোন্ ঘোড়া জিতবে জানা ও সেই সুবাদে কিছু অর্থ লাভ করা।

এখন এর সঙ্গে কি ভক্তির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে? বিন্দুমাত্রও না। এইরকম অনেক উদাহরণ আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রকৃত ভক্তি কি? সত্যকার ভক্ত কে তা আমরা বুঝতেই পারি না। প্রকৃত ভগবৎ প্রেমিকের কাছে যে কি চাইতে হয় তা বোঝার বুদ্ধিই যে সাধারণের কত কম এর দ্বারা তা প্রকট হয়। মানুষের দুর্বলতা, মূঢ়তা এমনই যে সে নিতান্ত পার্থিব কিছু লাভের আশায় সাধুকে কাজে লাগাতে চায়।

সূত্রে যে বলা হয়েছে 'সিদ্ধঃ ভবতি', এই সিদ্ধি স্বভাবত পূর্বোক্ত সিদ্ধি বা সিদ্ধাই থেকে স্বতন্ত্র। এই সিদ্ধির অর্থ আদর্শের চরিতার্থতা আর সে আদর্শ হলো জীবনের পূর্ণতা সাধন, ঈশ্বরে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, তাঁরই মধ্যে একাত্ম হয়ে যাওয়া। এই উদ্দেশ্য যাঁর জীবনে সফল হয়েছে তিনিই এই ভক্তিলাভ করেছেন এবং সিদ্ধ হয়েছেন। তিনিই পূর্ণ মানব। এ কোন্

পূর্ণতা? এ পূর্ণতা আসে ঈশ্বরপ্রেম থেকে, অন্য কোন সম্পদ নয়, কোন বিভূতি নয়, জীবনের অন্য কোন ক্ষেত্রেই নয়, একমাত্র দিব্যপ্রেমের প্রসঙ্গেই এই পূর্ণতা।

এ পূর্ণতার অর্থ সমস্ত সীমার ঊর্ধ্বে যাওয়া। ঈশ্বরের প্রতি এ সীমাহীন ভালবাসা। ঈশ্বর যেমন অসীম, তাঁর প্রেমও তেমনি অসীম। এই-ই সিদ্ধি শব্দের অর্থ।

দ্বিতীয় লক্ষণ ছিল, 'অমৃতঃ ভবতি', তিনি অমরত্ব লাভ করেন। সাধারণভাবে অমরত্বের অর্থ অনন্তকাল এই শরীরে বেঁচে থাকা। স্পষ্টত তা অসম্ভব। এ অমরত্বের অর্থ এই নয় যে এই যে আমাদের দেহ, যাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে চাই, তা একটা স্থায়িত্ব লাভ করবে। আজ যেমন আছি চিরকাল তেমনই থাকব, একেই আমরা ভাবি অমর হওয়া। আর এই পাঞ্চভৌতিক দেহে যদি তা সম্ভব না-ও হয়, সূক্ষ্মদেহে থাকব এবং স্বর্গবাসী অমর দেবতা বা দেবদূতদের মতো আমরাও অমরত্ব উপভোগ করব।

কিন্তু এ অমরত্ব তো কল্পনা, উপকথা মাত্র। ভক্ত এ অমরত্ব চান না। তাঁর দেহের প্রতি সব আসক্তি দূর হয়েছে আর সেই সঙ্গে দূর হয়েছে মৃত্যু ভয়ও। আসলে, মৃত্যুটা কি? মৃত্যু হচ্ছে এই দেহ-ইন্দ্রিয়, আমাদের এই সাধারণ পরিচিত অহং-এর থেকে বিচ্ছেদন-বিমুক্তি। দেহেন্দ্রিয় ও অহং-এর সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকাই মৃত্যু।

যখন জগতের সমস্ত বস্তুর প্রতিই সম্পূর্ণভাবে আসক্তি চলে যায় তখনই ভক্ত অমরত্ব লাভ করেন। কোন নশ্বর বস্তুর মূল্য তাঁর কাছে না থাকায় তিনিও হয়ে যান অবিনশ্বর। মরণের ভয় আর তাঁর থাকে না।

দৈহিকভাবে অমর না হলেও তিনি তখন নিজেকে জানেন সেই শুদ্ধ আত্মস্বরূপ রূপে। এমন কোন বস্তু আর তাঁর থাকে না যার প্রতি তাঁর সামান্যতম স্পৃহা বা আসক্তি আসতে পারে, যা তাঁকে অপবিত্র করতে পারে, গণ্ডিবদ্ধ করতে পারে অথবা মনে হয় যেন তার দ্বারা তিনি কিছুটা সঙ্কীর্ণ হয়েছেন বা তাঁর সামান্য অধোগতি হয়েছে। জীবনের আসক্তির দিকটা সম্পূর্ণ-বিলুপ্ত হওয়ার জন্যই তিনি আজ অমৃত।

শ্রীরামকৃষ্ণ একবার স্বামীজীকে (তখন নরেন্দ্র) বলেন,"মনে কর যে এক খুলি রস আছে আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোনখানে বসে রস খাবি? নরেন্দ্র বললে, আড়ায় বসে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, কেন? মাঝখানে গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে, তাহলে যে রসে জড়িয়ে মরে যাব। তখন আমি বললুম, বাবা সচ্চিদানন্দ-রস তা নয়, এ-রস অমৃতরস, এতে ডুবলে মানুষ মরে না; অমর হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, পৃঃ ১১২৫)। ভক্তি অমৃতস্বরূপ। তাই সে অমৃত যে পান করে সেও অমৃত হয়। কারণ একবার এই প্রেমভক্তির স্বাদ যে পেয়েছে সে তা জীবনভোর আস্বাদন করে। তার কাছ থেকে সে প্রেম কখনও ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। কেন না প্রেম ও প্রেমিক তখন অবিচ্ছেদ্য হয়ে যায়। প্রেম তার জীবনেরই অঙ্গ, সে যতদিন থাকবে তার হৃদয়ে প্রেমও থাকবে।

এ কথাটা নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, যা আমাদের প্রয়াসলব্ধ কর্মের মধ্য দিয়ে আমরা লাভ করি, তা বিনাশধর্মী। এ সম্পর্কে উপনিষদে একটি দৃষ্টান্ত আছে। এক কৃষক কিছু বীজ বপন করল, কালে তার থেকে ফসল উৎপন্ন হলো। যা উৎপন্ন হলো সংসারের কাজে ব্যবহার করতে করতে একদিন সব শেষ হয়ে গেল। এর তাৎপর্য যা উৎপন্ন বস্তু,

যা আমাদের কর্মফল তা ক্ষণস্থায়ী, তা নিঃশেষিত হতে বাধ্য। কিন্তু প্রেম ক্রিয়াসাধ্য নয়, কর্মফলও নয়। প্রয়াস প্রযত্নের দ্বারা প্রেম হয় না। সুতরাং হৃদয়ে একবার প্রেমের উদয় হলেই আর ক্ষয় নেই। প্রেম আমাদের হৃদয় থেকে সব অশুদ্ধ ভাব দূর করে দেয়, বহুজন্মসঞ্চিত যেসব সংস্কার প্রেমের পথে বাধা সৃষ্টি করে আছে তাদের সরিয়ে দেয় কিন্তু স্বয়ং কোন কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হয় না। এই অপবিত্র ভাব এবং অসম্পূর্ণতা দূর হলে স্বতই প্রেমের প্রকাশ ঘটে। প্রেম কিছুর পরিণাম নয়, তা নিত্য বর্তমান। কেবল আমরা তার স্বাদ জানি না। উৎপন্ন নয় বলে তার ক্ষয়ও নেই, তা অবিনাশী।

আমাদের ভাল লাগার বা ভালবাসার এমন কোন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ই থাকতে পারে না যার চিরস্থায়ী প্রভাব পড়তে পারে আমাদের উপর। যখনই সে বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচরে চলে যায়, ভাল লাগার অনুভূতিও আর থাকে না। যেমন মিষ্টি খেতে ভালবাসি, যতক্ষণ খাচ্ছি বেশ লাগছে, কিন্তু সে ভাল লাগাটা একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। যতক্ষণ খাদ্যবস্তুটির সঙ্গে রসনেন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ থাকছে এই ভাল লাগার অনুভূতিও ততক্ষণ পর্যন্তই। এর একটি যেই থাকবে না অনুভূতিও থাকবে না।

কিন্তু দিব্যপ্রেম তা নয়। এর সঙ্গে কোন বহির্বস্তুর সংস্পর্শ নেই বলেই এর সমাপ্তিও নেই। এটি সদাবিদ্যমান, এ আমাদের সত্তাস্বরূপ। আমার 'আমি'র মতো এ প্রেমও আমার মধ্যে একাত্ম হয়ে নিত্য বর্তমান, কারণ আমিই সেই প্রেমস্বরূপ। শাস্ত্র বলছেন, সেই পরমানন্দ থেকেই এই জগতের উদ্ভব, আনন্দেই এর স্থিতি আর সেই আনন্দেই এর লয়।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি" (তৈ. উ. ৩।৬)। এই আনন্দই ব্রহ্ম আর এই-ই দিব্যপ্রেম। এই আনন্দই সৎ ও আমার সত্তা। কিন্তু বিচ্যুত না হলেও মন নানা বিষয়ে জড়িত থাকে বলেই সে আনন্দকে আমরা বিস্মৃত হয়ে থাকি। কিন্তু গভীর নিদ্রার সময় যখন আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে মনে রাখতে পারি না তখন কি সে অস্তিত্বের বিলয় ঘটে? তা তো নয়। কারণ লয়ই যদি হতো তবে তা 'আমি'-র ধারাবাহিকত্ব বিনষ্ট হতো। কিন্তু যে আমি জাগ্রত অবস্থায় সব ভোগ করছি, সেই আমিই তো স্বপ্ন দেখছি এই কথা বলি। আবার সেই 'আমি'-ই সুষুপ্তি থেকে জেগে উঠে বলি 'আমার' তখন কোন বিষয়েরই অনুভব ছিল না।

নিজের আমিত্বের বিলুপ্তি কেউই অনুভব করতে পারে না। সেটা অনুভব করার জন্যও সাক্ষী বা অনুভোক্তার প্রয়োজন। তাই সুষুপ্তি বিলয় নয়, চিত্তের একটা স্থিতি মাত্র। ব্যাপারটা এই জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রতিটি অবস্থাতেই কিছু প্রতিবন্ধক থাকে। সেই প্রতিবন্ধকটি সরিয়ে ফেলতে পারলে যা থাকে সেই আমিই সত্যিকার আমি—সেই-ই আত্মা, সেই নিত্য প্রেমরূপ। এই-ই হলো দার্শনিক সিদ্ধান্ত। এইভাবে দেখলে বোঝা যায় এ প্রেম কোন আগন্তুক ভাব নয়, এ অনুভাবকারীরই সত্তা। এটিই অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। প্রেম যে অমৃতস্বরূপ এই তৃতীয় সূত্র থেকেই এই নিহিতার্থটি আমাদের অনুভব করতে হবে।

জীবনে একবার যদি এই প্রেমের আস্বাদন হয় তবে জগতের সমস্ত কাম্যবস্তু তুচ্ছ হয়ে যায়। সমস্ত আনন্দানুভবকে ছাড়িয়ে যায় এই পরমানন্দের অনুভূতি। এ প্রেম অসীম অনন্ত, কোন কিছুর দ্বারা এর আর হ্রাসও হয় না আর বৃদ্ধিও হয় না।

তৃতীয় লক্ষণ ছিল, 'তৃপ্তো ভবতি'। ভক্ত তৃপ্ত হয়। তৃপ্তির অর্থ কি? না তিনি সর্ব বাসনা থেকে মুক্ত হন। আগে বলেছেন ভক্ত অমৃত হন। তারই এটি অনুসিদ্ধান্ত যে তাঁর আর কোন কামনা-বাসনা থাকে না। সন্তোষ শব্দের এই অর্থ। আমাদের কোন একটা বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রতি যদি আকাঙ্ক্ষা থাকে সেটি খেয়ে বলি তৃপ্তি পেলাম। অর্থাৎ কোন বস্তু পাবার ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াই তৃপ্ত হওয়া। ইচ্ছাটা তখন মিলিয়ে যায়। 'তৃপ্তো ভবতি', এই বাক্যাংশে সেই কথারই প্রতিধ্বনি, সব ইচ্ছা নিঃশেষিত হয়ে মিলিয়ে গেল।

যতক্ষণ বাসনা থাকে ততক্ষণ তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি আসতে পারে না। ধন, সম্পদ, মান, ঐশ্বর্য যে বিষয়েই হোক বাসনা থাকা পর্যন্ত আমরা অতৃপ্তি বোধ করি। যখন কারও ঈশ্বরের প্রতি এই প্রেম হয় তখন তাই সে পরিতৃপ্ত, কারণ অন্য কিছু পাবার আকাঙ্ক্ষা তার আর থাকে না। গীতায় বলছেন, "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" (৬।২২) অর্থাৎ যাকে পাবার পর অন্য কোন লক্ষ্য বস্তুকেই তার থেকে শ্রেষ্ঠ মনে হয় না। এই হলো তৃপ্ত শব্দের তাৎপর্য। দৈনন্দিন জীবনে হয়তো একটা বস্তু পেয়ে আমি তৃপ্ত হতে পারি কিন্তু অপর কোন বস্তুকে ঘিরে আমার অতৃপ্তি থাকে। বাসনার শেষ নেই। কিন্তু এই পরমপ্রেমের যিনি অধিকারি তাঁর আর অন্য কোন বস্তু পাবার আকাঙ্ক্ষাই থাকে না। তাই তৃপ্তিও ব্যাহত হয় না। সেইজন্যই বলছেন ভক্ত 'তৃপ্তো ভবতি'। এইভাবে ভক্তের তিনটি বৈশিষ্ট্য আমরা পেলাম। প্রথমত, 'সিদ্ধো ভবতি', তারপর 'অমৃতো ভবতি' এবং শেষে 'তৃপ্তো ভবতি'। প্রথমে পূর্ণতা তারপর নিত্যত্ব অর্থাৎ এ পূর্ণতা যেন ক্ষণস্থায়ী না হয়। কিন্তু অমৃত হয়েও আমার মধ্যে অতৃপ্তি থাকতে পারে, তাই সর্বশেষ লক্ষণ পরিতৃপ্তি—সর্বতোতৃপ্তি। এইভাবে ভক্তি ভক্তকে পূর্ণ করে—অমৃত করে, তৃপ্ত করে।

যখন আমরা কোন দেবমানবের সংস্পর্শে আসি তাঁর মধ্যে কি দেখি? দেখি তিনি পূর্ণকাম, তিনি অমৃত অর্থাৎ সর্বতোভাবে অনাসক্ত এবং তিনি সদাপ্রসন্ন। যাঁর হৃদয়ে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত, যিনি বিগলিতচিত্ত, এ তিনটি বৈশিষ্ট্য তাঁর থাকবেই। কিন্তু সাধারণের আকাঙ্ক্ষিত সেই কতকগুলি অলৌকিক ক্ষমতা বা যা কখনই প্রকৃত সুখ দিতে পারে না এমন হাজারও ইচ্ছা পূরণের শক্তির জন্য প্রকৃত ভক্তের কোন আগ্রহই থাকতে পারে না।

যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫ ॥

অন্বয় ঃ যৎ (যে বস্তু) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হয়ে) কিঞ্চিৎ (অপর কোন বস্তুই) ন বাঞ্ছতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) ন শোচতি (দুঃখ অনুভব করেন না) ন দ্বেষ্টি (বিদ্বেষপরায়ণ হন না) ন রমতে (আনন্দে উৎফুল্ল হন না) ন উৎসাহী ভবতি (অন্য কোন বিষয়ে আগ্রহী হন না)।

অর্থ ঃ যে বস্তু লাভ করার পর ভক্ত অন্য কোন বস্তু কামনা করেন না, কোন বিষয়ে শোক করেন না, কোন ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন না, কোন কিছুতে আনন্দে উৎফুল্ল হন না এবং কোন কর্মের জন্য আগ্রহ বোধ করেন না।

ব্যাখ্যা ঃ এতক্ষণের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে একবার এই ভালবাসার আস্বাদ লাভ করলে তার তুলনায় এমন কোন বস্তু নেই যা পাবার বাসনা জাগতে পারে। এই অভিজ্ঞতার কাছে অন্য সব অভিজ্ঞতা

ম্লান হয়ে যায়। এই অপরিসীম অন্তহীন হ্রাসবৃদ্ধিহীন আনন্দের কাছে অন্য যে কোন আনন্দই তুচ্ছ।

এই প্রেম যিনি অনুভব করেছেন তাঁর আর দ্বিতীয় কোন চাইবার বস্তু থাকতে পারে না। তিনি তাই কোন কিছুর জন্য দুঃখও করেন না কারণ কোন বস্তুর প্রতি তাঁর বিরূপতাও নেই, আকর্ষণও নেই। কোন বিশেষ কর্মের জন্য তিনি কোন উৎসাহও বোধ করেন না। এটা খুব চিন্তা করে দেখবার বিষয়। সত্যিই তো যখন আমাদের চরম ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায় তখন আর কোন্ বিষয়ে আমাদের নতুন করে আগ্রহ জাগতে পারে? গীতায় সেইজন্যই বলেছেন, যখন আমরা সব পেয়ে যাই, সেই আপ্তকাম অবস্থায় আর নতুন কোন বাসনা জাগতে পারে না। সেই মহতী ইচ্ছা পূর্ণ হলে এমন কোন বস্তু আর থাকে না যার জন্য লালায়িত হতে হবে। পূর্ণ মনোরথ ব্যক্তির আর কি ইচ্ছা অপূর্ণ থাকতে পারে? তার পরের কথা ভক্ত শোক করেন না। কেন? কারণ প্রথমত, তিনি সব পেয়েছেন, তাঁর আর নতুন করে কিছু পাবার নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি যা পেয়েছেন তা আর হারাবার ভয় নেই। তাই তাঁর দুঃখও নেই। অপূর্ণতা বোধ থেকেই আমাদের বাসনার জন্ম, আর প্রিয় বিয়োগ বা প্রিয় কোন বস্তুর বিনাশই দুঃখের কারণ। কিন্তু যিনি এই প্রেম লাভ করেছেন, তাঁর যেমন আর কোন আকাঙ্ক্ষার বস্তু নেই, তেমনি এই প্রেম অব্যয় অবিনাশী বলে তা হারাবারও ভয় নেই। সংসারের অনেক ব্যক্তি, অনেক বস্তুই হয়তো তাঁর হারিয়ে যাবে, বিনষ্ট হবে, শরীরও একদিন থাকবে না। কিন্তু সে সবে তিনি বিচলিত নন, কারণ তিনি যা লাভ করেছেন তার তুলনায় এসব অতি তুচ্ছ। তিনি সদা তুষ্ট, নিত্যতৃপ্ত সুতরাং শোক দুঃখের অতীত।

অভীপ্সিত বস্তু লাভের পথে যা বাধা সৃষ্টি করে তারই বিরুদ্ধে আমাদের বিদ্বেষভাব জাগে। যা আমরা পেতে চাই সে পথে যখন কেউ বিঘ্নস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় তখনই তার প্রতি আমরা বিদ্বিষ্ট হই। কিন্তু ভক্ত যখন তাঁর প্রিয়তমের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে একীভূত হয়ে যান তখন কোন কিছুই তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ বা বিরোধ ঘটাতে পারে না। সুতরাং তখন আর কার-বিরুদ্ধে বিদ্বেষ থাকবে? আরও একটা কারণ হচ্ছে যে তাঁর নিজের তো অপরের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র বিরাগ বা বিদ্বেষ নেই। সকল ব্যাপারেই যে ঈশ্বরের হাত আছে, ঈশ্বরই যে সবার মধ্যে বিরাজমান তা তাঁর উপলব্ধিতে তখন সুস্পষ্ট। তাই কোন ব্যক্তি বা কোন ঘটনা সম্বন্ধেই তাঁর কোন অনুযোগ না থাকায় তিনি কার বা কিসের প্রতি বিদ্বিষ্ট হবেন?

আর উল্লাসেরও কোন অনুভব তাঁর হয় না। যা পাইনি অথচ পেতে চাই সেই বস্তু পেলে আমরা উল্লসিত হই। কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র। তিনি যা পাবার তা পেয়েই গেছেন, এমন কোন নতুন বস্তু নেই, যা পেয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হবেন।

শেষে বলছেন, তিনি কোন বিষয়েই উৎসাহ বোধ করেন না। যা আমাদের কোন কাজে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে তাকেই উৎসাহ বলি। আমরা কাজ করি কিসের জন্য? একটা প্রাপ্তির আশায়। কিন্তু ভক্ত তো তাঁর যা পাবার ছিল সেই ভক্তিধন পেয়ে গিয়েছেন। অতএব নতুন করে কিছু পাবার নেই বলেই তাঁর নতুন করে কোন কাজে প্রবৃত্ত হবার উৎসাহ দেখা দেয় না। এখানে একটা সংশয় জাগতে পারে যে যিনি এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারি তাঁর জীবনের আর প্রয়োজন কি? তিনি থাকবেনই বা কি নিয়ে? তাঁর জীবন তো একটা জড় পাথরের মতো। না

তা নয়, তিনি জড় বলেই যে তাঁর সর্ববিষয়ে অনাগ্রহ তা নয়। এক্ষেত্রে তিনি পরিপূর্ণ বলেই বিষয়ান্তরের প্রতি তাঁর এই অনীহা। তিনি পূর্ণস্বরূপ বলেই তাঁর অন্তর-বাহির এত শান্ত। যদি সমুদ্রের মধ্যে একটি ঘট থাকে তার ভিতরে বাইরে সব জলে পূর্ণ তখন সেই ঘটস্থিত জলের কি কোন গতি থাকতে পারে? পারে না। কারণ জলের গতির অর্থই হলো যেখানে জল নেই সেদিকেই সে প্রবাহিত হবে। যে কোন গতিরই অর্থ একদিকে শূন্য করে আর একদিকে পূর্ণ করা। এখন যাঁর অন্তর বাহির নিবিড় ভালবাসায় পরিপূর্ণ, তিনি তখন স্বতই শান্ত সমাহিত। সেইজন্য তাঁর তখন বিষয়ান্তরে মনের আগ্রহ বা উৎসাহ থাকে না। কিন্তু এটি জড়ত্ব অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাড্য বা জড়তার অর্থ যেখানে কোন প্রাণশক্তিই কাজ করে না। কিন্তু ভক্ত প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, যদিও স্থির শান্ত। তিনি গভীর প্রেমে এমনই নিমজ্জিত যে কোন চাঞ্চল্যই তাঁর মধ্যে নেই, এই-ই তাঁর উদ্যমহীনতা বা অনুৎসাহের রহস্য।

এই গুণগুলিই হলো ভক্তের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আবার বলা যায় এই লক্ষণগুলির দ্বারাই ভক্তকে চেনা যায়। বিপরীতক্রমে, একথাও ঠিক যে সাধনা বা ভক্তির সাহায্যেই এই গুণাবলী অর্জন করতে হয়। একে সাধনা বলা হয় এইজন্য যে সিদ্ধ পূর্ণকাম পুরুষের এই যে সব বৈশিষ্ট্য, এগুলিই সাধক অবস্থায় তাঁকে সাধন করতে হয়েছে। সেইসময় তাঁকে মন থেকে ভক্তি ভিন্ন সমস্ত কামনা দূর করবার অনলস প্রয়াস করতে হয়েছে। যখন তিনি এতে সিদ্ধ হয়েছেন তখনই অন্য সব বস্তু সম্বন্ধে তাঁর স্পৃহা চলে গিয়েছে। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে আগ্রহ না থাকায় কোন বস্তুর বিনাশ বা অপ্রাপ্তিজনিত শোক তাঁর আর থাকে না। সেই দিক থেকেই এটি সাধনা। সাধক অবস্থায় অন্য সব বস্তুকে তাঁর তুচ্ছ জ্ঞান

করতে হয় এবং সেই তুচ্ছতা জ্ঞান পাকা হলে তখন আর কোন বিষয়েই তাঁর না থাকে বিদ্বেষ, না থাকে হর্ষ। তাঁর কাছে তখন শুদ্ধাভক্তি ভিন্ন আর সবই মূল্যহীন। সেইজন্য কোন কর্মে তখন আগ্রহ বা উৎসাহ থাকতে পারে না।

সাধারণ লোকের পক্ষে এ অবস্থাটি বোঝা সহজ নয়। তারা সবটাই দেখতে চায় একটা সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাদের মনে হয় একজন সচেতন মানুষের তো এর বিপরীত লক্ষণগুলিই থাকা স্বাভাবিক। তা না থাকার দরুণ তাদের কাছে এইরকম ভক্ত যেন জগতেরই মানুষ নন, এমনটিই মনে হয়। তাদের কাছে এ যে এক নিষ্প্রাণ জড়মূর্তি।

কিন্তু এতক্ষণ ধরে যা আমরা আলোচনা করছি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বোঝা যায় এই ভক্ত নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ হয়ে আছেন বলেই সাধারণ মানুষের অনুভূতিসমূহ তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না। যিনি সিদ্ধ তাঁর আচার আচরণ যিনি সিদ্ধি লাভ করেননি তাঁর থেকে পৃথক হবে এই সহজ কথাটা না বোঝার জন্যই সাধারণ মানুষ তাঁদের জীবনকে ভাবে নিরর্থক অপচয়।

একবার একটা নাটকে পড়েছিলাম একজন জ্ঞানীর জীবন ও তাঁর সাধনাকে কেন্দ্র করে লেখা। তাতে দেখিয়েছে যে সেই সাধক এক সময় দশটি বছর ধরে একটি দেওয়ালের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তা তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর পূর্বপরিচিত এক ব্যক্তি অপর এক বন্ধুকে সঙ্গে করে তাঁর কাছে উপস্থিত হলো। বন্ধুটিকে সে বলে সাধকটির দেহে আঘাত করতে, কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়াই তাঁর হলো না। বন্ধুটি তখন ঐ ব্যক্তিকে বলল, "তুমি চেষ্টা

করে দেখ"। সেও আঘাত করল, কিন্তু কোন সাড়া নেই। প্রথম ব্যক্তি বলল, "আরও জোরে আঘাত করব"? 'কর'। অতএব দুজনেই তাদের সর্বশক্তি দিয়ে উপর্যুপরি সাধককে আঘাত করল। কিন্তু তাদের আঘাতের শব্দই সার। তাঁর দিক থেকে কোন সাড়া মিলল না। অবশেষে অনেক পরে যখন তাঁর সম্বিৎ ফিরল, তিনি বললেন, আমি অন্ধও না, বধিরও না। আমি জড় নই, কিন্তু আমি প্রজ্ঞার আলোক লাভ করেছি। একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে যাচাই করার কেমন বুদ্ধি আমাদের, কেমন মানসিকতা! জানি না, এই জাতীয় পরীক্ষায় আপনারা কয়জন সম্মত হবেন!

প্রকৃতপক্ষে একজন জ্ঞানীর প্রতিক্রিয়া কোন ভাবেই একজন অজ্ঞানীর সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। তবে তাঁর নিজের মধ্যে অপূর্ণতা নেই বলে যে তিনি অপরের অপূর্ণতা দেখতে পান না, তা নয়। কিন্তু যখন তিনি তা দেখেন তাঁর প্রতিক্রিয়া হচ্ছে কিভাবে তা সংশোধন করে তাঁকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। তাঁর নিজের তো সবই পাওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন তাঁর একটাই চিন্তা যে যাঁরা এ আনন্দে বঞ্চিত তাঁদের কিভাবে সাহায্য করবেন। একমাত্র তখনই তিনি আবার কর্মক্ষেত্রে নেমে আসেন। তাঁর দিক থেকে সে কর্ম তখন অকর্ম। একটা কলস যদি জলপূর্ণ থাকে কোন শব্দ হয় না, কিন্তু তার থেকে অন্য কলসে জল ঢালতে গেলে শব্দ হয়। ঠিক তেমনই যিনি আত্মারাম, তাঁর নিজের জন্য কর্ম থাকে না, কিন্তু চারপাশে অন্য সকলের দুঃখ দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন না এবং তখনই নিজের জন্য নয়, অপরের কল্যাণের জন্য তিনি আবার কর্মভার তুলে নেন।

এই যে বলা হয়েছে তিনি কিছু চান না, শোক করেন না ইত্যাদি এর অর্থ তাঁর নিজের আর কিছু প্রয়োজন নেই। আপাত কোন ক্ষয় ক্ষতি বা প্রাপ্তি তাঁকে শোকার্তও করে না, হৃষ্টও করে না। নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য কোন কর্মে তাঁর আগ্রহ বা উদ্যম নেই। এইজন্য এই লক্ষণগুলি তাঁর মহত্ত্বেরই সূচক। তিনি স্থানু নন, প্রস্তরবৎ জড় নন। তিনি যা করেন তা সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন। তাঁর কাজ পরহিতার্থে জীবকল্যাণের জন্য, নিজের জন্য নয়। ভক্তের জীবন সাধারণের কাছে অবোধ্য বলেই তাঁদের কাছে সে জীবন সমালোচনার বিষয়। কিন্তু ভক্ত বা সাধককে বিচার করতে হয় সাধকের ভূমি থেকে, ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

যৎ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি ॥ ৬ ॥

অন্বয় ঃ যৎ (যা) জ্ঞাত্বা (জেনে) মত্তঃ (মাতাল) ভবতি (হয়) স্তব্ধঃ (নীরব) ভবতি (হয়) আত্মারামঃ (নিজের মধ্যেই আনন্দে বিভোর) ভবতি (হয়)।

অর্থ ঃ যাঁকে জানার পর ভক্ত যেন মাতাল হয়ে পড়ে, জড় বস্তুর মতো নির্বাক নিশ্চল হয়ে যায় এবং নিজের মধ্যে নিজে আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ এর পূর্বের সূত্রটিতে ভক্তের লক্ষণ বলা হয়েছে নেতিমুখে। তিনি দ্বেষ করেন না, হৃষ্ট হন না, কিছু বাঞ্ছা করেন না—কিছুতেই তাঁর উদ্যম বা আগ্রহ নেই ইত্যাদি। বর্তমান সূত্রে ইতিবাচক-ভাবে ভক্তের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হচ্ছে। এই ভক্তি লাভ করলে

ভক্ত গভীর আনন্দে নিমজ্জিত হয়ে যেন উন্মত্ত হয়ে পড়েন। এই মত্ততার দ্বারা বোঝাচ্ছেন যে এই ভক্তিতেই বুঁদ হয়ে থাকা, সম্পূর্ণ ডুবে থাকা। মত্ত ব্যক্তির যেমন বহির্জগত সম্বন্ধে কোন হুঁশ বা চেতনা থাকে না, বিমুক্তাত্মা ব্যক্তি তেমনি এক আনন্দ সুরায় ডুবে থাকেন। বাইরের জগতের কোন সংবাদই তাঁর কাছে পৌছয় না। কিন্তু ঈশ্বর প্রেমে পাগল হয়ে এই আনন্দ-বিহ্বল ভক্ত কি সাধারণ মত্ত ব্যক্তির মতো উগ্র হয়ে উঠবেন? তা কখনও নয়। তিনি তখন পূর্ণানন্দ এবং সেইজন্যই স্তব্ধ হয়ে যাবেন, তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য কর্মচাঞ্চল্য কোনটাই দেখা যাবে না। এই স্তব্ধতার হেতু এই যে আনন্দ তিনি নিজের ভিতর থেকেই পাচ্ছেন। বাইরের কোন বস্তুর উপর এ আনন্দ নির্ভর করে না, এ তাঁর অন্তর হতে উৎসারিত আনন্দধারা—এইটি ভক্তের বিশেষ আধান।

এই তত্ত্বটি উপনিষদে অন্যভাবে বলা হয়েছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যখন জ্ঞানযোগীর উপলব্ধির বিষয়ে বলতে গিয়ে বলছেন যে, সেই ভূমিতে সকল বহির্বিষয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তখন মৈত্রেয়ী বিমূঢ় হয়ে প্রশ্ন করছেন, "তবে এ ভূমিতে উপনীত হয়ে কি লাভ? এ তো জড়ের অবস্থা, সেখানে আনন্দ কোথায়?" যাজ্ঞবল্ক্য তখন ব্যাখ্যা করছেন যে, এ অবস্থায় তাঁর কোন বিষয়বোধ থাকে না সত্য, কিন্তু বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানে বুঝি সেই বস্তু বা বিষয়েরই প্রাধান্য। এটি বস্তু-নির্ভর জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানীর এই ভূমিতে আছে বস্তু-নিরপেক্ষ জ্ঞান অর্থাৎ প্রজ্ঞা।

যাজ্ঞবল্ক্যকে মৈত্রেয়ীর কাছে আরও ব্যাখ্যা করতে হলো যে, সাধারণভাবে যেমন একটা ভাব বা বস্তুর উদয় ও লয় হয় সেটার সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা থেকে। কিন্তু এই বিজ্ঞানভূমিতে সেই সচেতনতা থাকে না কারণ কোন বস্তুর উপর এই জ্ঞান নির্ভরশীল নয়। বাইরের

সমস্ত বিষয় গুটিয়ে তখন তাঁর কাছে এক সৎ-ই বর্তমান, তাই অন্য দ্রষ্টব্য বিষয় তখন তাঁর কাছে বিলুপ্ত। এই অর্থেই জগৎ সম্বন্ধে তাঁর চেতনার অভাব হয়েছে, কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টা পুরুষ সমভাবেই বর্তমান আছেন। সমস্ত 'বহু' তখন 'একে' বিলীন হয়েছে।

এখন ভক্তিযোগের ক্ষেত্রে বিষয়টি আমরা অন্য দিক দিয়ে দেখতে পারি। ভক্ত যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হন তখন তাঁর আনন্দ বাইরের কোন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল থাকে না। এ আনন্দ তাঁর অন্তরস্থিত ইষ্টদেবতাকে কেন্দ্র করে, তাই তা নিত্য। কোন বহির্বিষয় আনন্দের উৎস হলে বিষয়টি অন্তর্হিত হলে, আনন্দও তিরোহিত হয়। কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে আনন্দের জন্য কোন বহির্বস্তুর অপেক্ষা নেই তাই এ আনন্দ কোথাও সীমাবদ্ধ নয়। নিরপেক্ষ নির্বাধ নিঃসীম আনন্দ। 'আত্মারাম' কথাটির দ্বারা এই অবস্থাটিই বোঝানো হচ্ছে। আত্মারাম কথাটি উল্লেখ না করলে মনে হতে পারত এ যেন সাধারণ জাড্যাবস্থা, এক মূক বা মূঢ় দশা বা উন্মত্ততা। এই পার্থক্যটি বোঝাবার জন্যই তাঁকে আত্মারাম বলা হয়েছে। যার অর্থ তিনি নিজের মধ্যেই পেয়েছেন আনন্দের উৎস। তিনি আত্মাকে জেনেছেন ও আত্মাকে কেন্দ্র করেই তিনি আনন্দে বিভোর।

ভক্ত যখন এই ভগবদুপলব্ধির আনন্দে সম্পূর্ণ নিমগ্ন থাকেন তখন আর বাইরের কোন বস্তুর আকর্ষণ তাঁর থাকে না। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। যখন তাঁর এই অবস্থাটিই সব থেকে কাম্য বলে বোধ হয় আর যদি তিনি জগতের প্রতি সংবেদনশীল হন, তবে স্বভাবতই তাঁর ইচ্ছা হবে অন্যদেরও এই আনন্দের অংশীদার করতে। তিনি নিজে এই অবস্থা লাভ করে যতটা আনন্দিত ততটাই তাঁর বেদনাবোধ থাকে যে অপরে এই আনন্দের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। আর তাই তাদের সাহায্যের জন্য তিনি

তাঁর সময় ও শক্তি যথাসম্ভব প্রয়োগ করতে তৎপর হন। তবে সব ভক্তই যে এ রকম জগদ্ধিতায় আত্মনিয়োগ করেন তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে, একজন ভগবানের দিকে যত অগ্রসর হয় তত তাঁর কর্ম কমে যায় এবং শেষকালে সে যখন ঈশ্বর লাভ করে তাতেই মগ্ন থাকে। সাধারণভাবে একথা বললেও এঁদের থেকে মহত্তর আর এক শ্রেণীর ভক্তের আদর্শ তাঁর ভাবনায় ছিল। সে কথা তিনি সকলের সামনে বলতেন না। কারণ সেই স্তরে ওঠার জন্য যে বিশেষ আধার প্রয়োজন সকলের পক্ষে তার অধিকারি হওয়া সম্ভব নয়। অধিকাংশ সাধকের পক্ষে নিজের মুক্তি সাধনই যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর থেকেও মহৎ উদ্দেশ্য নিজের মোক্ষের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও সেই মোক্ষলাভে সাহায্য করা। এটি আরও উচ্চ আদর্শ।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে জানা যায় যে, নির্বাণ লাভের পর তিনি সাতদিন পর্যন্ত সেই পরম আনন্দে নিমগ্ন ছিলেন। বহির্জগত সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁর ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে বাইরের বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর চেতনা ফিরলে তিনি দেখলেন এই জগৎ জুড়ে দুঃখের অন্ত নেই। এই দুঃখবোধই একদিন তাঁকে নির্বাণের সন্ধানে প্রবৃত্ত করেছিল। কিন্তু সেই নির্বাণ লাভ করে তিনি এমন এক তন্ময়তায় ডুবে ছিলেন যে তার থেকে যেন তিনি বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। সেই সময় তাঁর অন্তর থেকে সমস্ত দুঃখবোধ অন্তর্হিত হয়েছিল। সাতদিন পর কিন্তু যখন সেই তন্ময়তা তাঁর স্বভাবেরই অঙ্গ হয়ে উঠল, সেই স্থিতি তাঁর সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠল, তখন চারিদিকের জনগণের মধ্যে তাঁর সেই পূর্বপরিচিত দুঃখ দুর্দশাকে আবার নতুন করে দেখলেন ও তার থেকে নিবৃত্তি লাভের উপায় প্রচারে প্রবৃত্ত হলেন।

সিদ্ধপুরুষের কর্মজীবন এইভাবেই শুরু হয়। কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কর্মের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য আছে। জ্ঞানী সমস্ত কর্মই অপরের কল্যাণের জন্য করেন, নিজের জন্য নয় আর অজ্ঞানীর কর্ম তার নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তার সব কর্মই স্বার্থকেন্দ্রিক।

আরও একটি বিষয় বুঝবার আছে। জ্ঞানী যে সর্বদাই অপরের কল্যাণের জন্য কর্মে নিযুক্ত থাকবেন তা নয়। যদি তিনি সেই পরম উপলব্ধিতেই সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে থাকতে চান তবে তিনি আর কর্মজীবনে না-ও ফিরতে পারেন, এটা তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি ফিরবেনই না তা-ও নয় আবার ফিরবেনই যে তা-ও নয়। তিনি নিজ অন্তরে ধ্যানমগ্ন হয়েও থাকতে পারেন, কর্মসমুদ্রে ঝাঁপিয়েও পড়তে পারেন। এই দ্বিতীয় থাকের সিদ্ধপুরুষদেরই শ্রীরামকৃষ্ণ মহত্তর ভক্ত বলেছেন। প্রথম শ্রেণীর ভক্তরা অবশ্যই পরম শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ পুরুষ তাঁরাই যাঁরা জগৎ কল্যাণের জন্য নিজের মুক্তির আনন্দকেও তুচ্ছ করেন। কিন্তু সবাই তো সেই মহত্তর আদর্শের অধিকারি হতে পারেন না। সুতরাং যাঁরা কেবলমাত্র আত্মমোক্ষের প্রয়াসী, তাঁরাও তাঁদের পথে ঠিক চলেছেন সেই প্রাপ্তির আনন্দে থেকে গেলে তা দোষের নয়। তবে সে আনন্দ অপরের হিতার্থে যাঁরা সরিয়ে রাখেন তাঁরা অধিকতর শ্রদ্ধার পাত্র।

এই রকম মহান আধিকারিক পুরুষ অতি দুর্লভ। এঁরা ক্ষণজন্মা, কিন্তু এঁদের জন্য উচ্চতম আধ্যাত্মিক আদর্শ হারিয়ে যায় না। যদি এঁরা আমাদের কল্যাণের জন্য নেমে না আসতেন, তাহলে আধ্যাত্মিক ভাবধারার পরম্পরা বিনষ্ট হয়ে যেত। এই সব সিদ্ধ সাধক বা সাধিকা সম্বন্ধে জগৎ কিছুই জানতে পারত না। এমনকি এই উচ্চতম আদর্শ

থেকেও আমরা অনবহিত থেকে যেতাম। কেবলমাত্র যখন তাঁরা সেই সিদ্ধভূমি থেকে করুণা করে এই ধরণীতে নেমে আসেন, জগৎবাসীর কাছে সেই পরমভূমির কথা ও সেই ভূমিতে উপনীত হবার পন্থা ও নিজেদের তৎকালীন সাধন ও উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন, তখনই আমরা সেই উচ্চভূমির কথা জানতে পারি। অন্য কোন উপায়ে নয়।

যিনি জগদ্ধিতায় আত্মসুখ ত্যাগ করেন আর যিনি নিজের মুক্তিরই প্রয়াস মাত্র করেন, তাঁরা দুজনেই ধন্য। তথাপি প্রথম জন শ্রেষ্ঠতর। স্বামীজীর জীবনের বিখ্যাত ঘটনাটি এই প্রসঙ্গে শেষ কথা। স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) নির্বিকল্প সমাধির আনন্দেই ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ভর্ৎসনা করে উঠলেন, "ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা! আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস! এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা! নারে, এত ছোট নজর করিসনি।"...(যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১ম ভাগ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, পৃঃ ১৫১) এ কথার মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে দুঃখতাপজর্জরিত মানুষের মুক্তির সাহায্যে এগিয়ে না এসে নরেন্দ্রনাথ নিজের আনন্দের কথাই চিন্তা করেছেন। এ চিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণের অনভিপ্রেত। শ্রেষ্ঠ মাপকাঠির বিচারেই তিনি স্বামীজীকে দেখতে চাইতেন। স্বামীজীও তাঁর প্রভুর মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, এবং পরবর্তিকালে বলেছিলেন যে, যতদিন না পৃথিবীর শেষ মানুষটির মুক্তি হয় ততদিন তিনি নিজের মুক্তি চান না। এই অসাধারণ আত্মত্যাগের জন্যই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতম সন্তান।

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭॥

অন্বয় ঃ সা (সেই ভক্তি) ন কাময়মানা (অন্য কোন বাসনার অপেক্ষা করে না) নিরোধরূপত্বাৎ (সংযমস্বরূপ এইজন্য)।

অর্থ ঃ সেই ভক্তি দ্বারা অন্য কোন কামনা বাসনা পূরণের প্রয়োজন হয় না। কেন না সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সর্বতোভাবে সংযম হলে তবেই এই ভক্তি লাভ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ এর আগের ছয়টি সূত্রে নারদ প্রকৃত ভক্তের লক্ষণ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। এখন এই সপ্তম সূত্রে (ভক্তির বিষয়ে) ভক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে আলোচনা করছেন। ভক্তির সাহায্যে কোন বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করা যায় না। কারণ ভক্তির মূল কথাই হচ্ছে সংযম ও নিরোধ। সমস্ত বাসনার উচ্ছেদ। যখন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে প্রকৃত ভক্তির উদয় হয় তখন তার মন থেকে যাবতীয় বাসনা কামনা চিরতরে মুছে যায়। ভক্তি নিরোধস্বরূপা বলেই তা কোন বাসনা-পূর্তির কারণ হতে পারে না। একই আধারে ভক্তি ও বাসনা বা বাসনা-পূরণের জন্যই ভক্তি—অতি অবাস্তব ব্যাপার।

সাধারণত ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকে কিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায়। যা আমরা অন্য কোনভাবে পাই না বা নিজের প্রচেষ্টায় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করি, তা যাতে ঈশ্বরের অনুগ্রহে পেতে পারি, সেজন্যই তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা। সেই প্রার্থিত বস্তু ধনসম্পদও হতে পারে, নাম-যশ বা সামাজিক বিশেষ মর্যাদা লাভও হতে পারে, হতে পারে অন্য কিছুও। আমাদের চাওয়ার কোন সীমা নেই, আর

আমরা ধারণাও করতে পারি না কি দ্রুততালে এই চাওয়ার পরিধি বেড়ে যাচ্ছে। তাই সাধারণ মানুষের পক্ষে এইসব ইচ্ছা পূরণের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে যে ভক্তি আমাদের আলোচ্য তা এই ধরনের প্রার্থনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বা বলা চলে বিপরীত। এখানে ভক্তিকে বলা হচ্ছে তাঁর প্রতি পরম প্রেম। অতএব অন্য কোন কামনা-বাসনা এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে না। সেইজন্য বলা হয়েছে, ভক্তি কোন ঈপ্সিত বস্তু প্রাপ্তির উপায় হতে পারে না। কারণ ভক্তি হচ্ছে সমস্ত কামনার নিরোধস্বরূপ। ভক্তির প্রকৃত তত্ত্ব জানার জন্য এই 'নিরোধস্বরূপ' কথাটি অতি মূল্যবান। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আমরা দেখছি ভক্ত চার রকমের—

'চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥' (৭।১৬)

১। **আর্ত**—যিনি বিপন্ন, বিপন্মুক্তির জন্য তিনি ভগবানের শরণাপন্ন হন।

২। **জিজ্ঞাসু**—যিনি সৃষ্টিতত্ত্ব, এই বিশ্বের রহস্য বা আত্মতত্ত্ব জানতে চান। যা তিনি নিজের চেষ্টায় কোনক্রমেই জানতে পারবেন না। সেই জ্ঞান লাভের জন্য তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন।

৩। **অর্থার্থী**—যিনি বিশেষ কোন বস্তু পেতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন যাতে তাঁর করুণায় তাঁর আশীর্বাদে তিনি সেই ঈপ্সিত বস্তু লাভ করেন।

৪। **জ্ঞানী**—তিনি জানেন ঈশ্বরই একমাত্র নিত্যবস্তু এবং তিনিই প্রাপ্তব্য। ঈশ্বরাভিমুখী তাঁর এই ভক্তি স্বত।

ভক্ত এই চার শ্রেণীর ।

গীতায় বলছেন, এঁরা প্রত্যেকেই মহৎ, কারণ প্রত্যেকেরই ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস আছে। তবুও যিনি জ্ঞানী ভক্ত, যিনি ঈশ্বরকে একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু বলে জেনেছেন—জেনেছেন যে ঈশ্বরকে জানার মধ্যেই সবকিছু জানার পরিসমাপ্তি, অবশ্যই তিনি শ্রেষ্ঠতম, তাঁর সঙ্গে অন্যদের তুলনা চলে না। ভগবানের মুখনিঃসৃত ঘোষণা 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্', (গীতা,৭।১৮)—জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ। 'প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ।' (গীতা, ৭।১৮)—সেই জ্ঞানী ভক্ত আমার অতি প্রিয়, আমিও তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। এই ভগদ্ভক্তি থেকেই বোঝা যায় যে ভক্তদের মধ্যে জ্ঞানী ভক্তের স্থানই সর্বোচ্চ—অন্যদের স্থান তাঁর নিচে। বর্তমান সূত্রে এই কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু একটু অন্যভাবে। যতক্ষণ ঈশ্বর আমাদের কাছে উদ্দেশ্য (উপেয়) নন—কিছু প্রাপ্তির জন্য উপায় মাত্র, ততক্ষণ আমরা নিজেদের প্রকৃত ভক্ত বলতে পারি না। প্রকৃত ভক্তের কাছে ভগবানই একমাত্র সাধ্য। তিনি অন্য কোন বস্তু প্রাপ্তির উপলক্ষ নন। প্রকৃত ভক্তি ইতর বস্তু প্রাপ্তির সাধন নয়—তা নিজেই সাধ্য বস্তু, কারণ ভক্তির সঙ্গে অন্য কোন বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষার সহাবস্থান হয় না। একটির নিবৃত্তি হলেই অন্যটির প্রবৃত্তি। যেখানে ভক্তির আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে আর কোন কিছুর বাসনাই জাগে না। এই সূত্রে সেই কথাটির উপর জোর দিয়েই বলা হয়েছে—সমস্ত বাসনার নিরোধই ভক্তি। ভক্তি অন্য কোন বাসনা পূরণের উপায় নয়।

আমাদের ভক্তি খাঁটি কি না তা বিচার করার এইটিই মাপকাঠি। সে ভক্তি যদি সত্যিই নির্ভেজাল হয়, তাহলে ঈশ্বরের কাছে কিছুই চাইব না। এমনকি জন্ম-মরণের হাত থেকে নিবৃত্তি বা মোক্ষ পর্যন্ত তাঁর কাছে চাইব না। এসব চাওয়া তো দূরের কথা, ভক্তিতে সুখের আর্তি পর্যন্ত

থাকে না, প্রকৃত ভক্ত তাও চায় না। আমরা যদি শান্তি ও আনন্দ পাবার জন্য ভক্তি লাভ করতে চাই, তবে ভক্তিও সাধন হয়ে গেল, সাধ্য হলো না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের কাছে ভক্তিই যে সাধ্য বস্তু। আমরা অনেক সময়ই বলে থাকি, একমাত্র ভক্তিতেই শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক। কিন্তু প্রকৃত ভক্তের লক্ষ্য শান্তি বা আনন্দ নয়। শুদ্ধা ভক্তিই তাঁদের লক্ষ্য। তাই ও-কথা যাঁরা বলেন তাঁরা একটু নিচের ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন, একথা বলতেই হয়। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁর 'ভক্তিযোগ'-গ্রন্থে এই বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন। যদি বাসনার লেশমাত্রও থাকে—তা সে যদি অতি মহৎ বাসনাও হয়—তবু তা বাসনাই, সুতরাং তা ভক্তি নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কি বলছেন? 'ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৬৪৪)। উক্তিটির তাৎপর্য তাহলে কি? এটা নিতান্তই ন্যায়ের একটি কূট। ভক্তির অর্থই বাসনার নিবৃত্তি। সুতরাং ভক্তি বাসনা জাগতিক কোন বাসনা হতেই পারে না। ভক্তিকামনার অর্থই হচ্ছে সকল বাসনার নিবৃত্তির জন্য কামনা। তাই সে কামনা কামনার অন্তর্গত নয়।

তাহলে ভক্তিকে আমরা দুটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি। একটি সাধন, অপরটি সাধ্য—আমাদের লক্ষ্য। কিন্তু আমরা এই গূঢ়ার্থটি অনুধাবন না করে চলতি কথায় দুটিকে একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলে ভক্তি শব্দটি ব্যবহার করি। ভক্তিকে যতক্ষণ আমি সাধন বা কোন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপায় বলে মনে করি ততক্ষণ ভক্তির মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনর আকাঙ্ক্ষা থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্যিই যদি লক্ষ্যে পৌঁছন যায়, তখন অপর কোন আকাঙ্ক্ষাই—তা সে যত মহত্তমই হোক—তা আর থাকে না।

সুতরাং বাসনার বিলয়—ভক্তির এই বিশেষত্বটি আমাদের মনে রাখতে হবে। আকাঙ্ক্ষার নিরোধই ভক্তির স্বরূপ। কি ধরনের এই আকাঙ্ক্ষা, এই কামনা-বাসনা, তা-ই পরবর্তী সূত্রে আলোচ্য।

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ নিরোধঃ (ত্যাগ) তু (কিন্তু) লোক-বেদ-ব্যাপারন্যাসঃ (লৌকিক ও বৈদিক সমস্ত কর্মের পরিত্যাগ)।

অর্থঃ নিরোধ বা ত্যাগ কথার অর্থ, লৌকিক ও বৈদিক সকল প্রকার কর্ম ঈশ্বরে উৎসর্জন।

ব্যাখ্যাঃ এখানে নিরোধ বা নিবৃত্তির অর্থ সবরকম লৌকিক আচার, বৈদিক অনুশাসন এবং যাবতীয় কর্মের পরিহার। অর্থাৎ নিরোধের দ্বারা লোকাচারবিহিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট যাবতীয় কর্ম থেকে উপরতির কথা বলা হয়েছে। বেদে বা শাস্ত্রে যেসব বিহিত বা অবিহিত কর্মের বিষয় বলা আছে সে সবেরই ঊর্ধ্বে যেতে হবে। সেই সঙ্গে পরিহার করতে হবে পার্থিব যে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্রয়াসও। বেদে মুক্তি, মোক্ষ বা অন্য যে সব প্রাপ্তব্য বস্তুকে লক্ষ্য বলে নির্দেশ করা হয়েছে সে সমস্তই যেমন ত্যাগ করতে হবে তেমনি আবার দৈনন্দিন জীবনেও কোন বস্তু প্রাপ্তির জন্য বা অপরকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা অপরের মতামতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার জন্য এই ভাবে বা ঐ ভাবে ব্যবহার করা বা লোকমত মেনে চলার যে নির্দেশ আছে সেগুলিকেও অগ্রাহ্য করতে হবে, কেন না এইসব নির্দেশের পশ্চাতে সবক্ষেত্রেই একটা নিগূঢ় অভিসন্ধি থাকে। বেদের নির্দেশ পালন

করি কারণ তদনুযায়ী কর্ম করলে তার বেদবিহিত ফল আমাদের অধিগত হবে। জনমত স্বীকার করে চলার পিছনে রয়েছে জনপ্রিয়তার লোভ বা জনগণের সমর্থন লাভের আশা। ভক্তের জীবনে কিন্তু এই সব চাহিদার কোন স্থান নেই। এই কথাটি বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে। কারণ বেদেই থাক, আর সমাজবিধিই হোক, আমরা প্রায়ই 'এটা কর, আর ওটা করো না'—এই বিধি নিষেধের দাস হয়ে পড়ি। এই সব নির্দেশ আমরা অন্ধের মতো অনুসরণ করি, আর ফলে বেদবিহিত কিছু পুণ্যের অধিকারি হই বা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাই। লোকের প্রশংসায় অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠি। এই কর্ম ও কর্মফলস্পৃহা কঠোরভাবে দূর করা দরকার।

প্রকৃত ভক্ত কখনই এইসব শাস্ত্রীয় বা লৌকিক নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হন না। শাস্ত্রনির্দিষ্ট যেসব শুভ কাজ আমরা তাঁকে করতে দেখি তা যে তিনি শাস্ত্র পড়ে শাস্ত্রের নির্দেশে করছেন তা নয়, তিনি তা করেন স্বীয় স্বভাবে। যে কাজই তিনি করেন তা শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুশাসন-নির্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু কাজটি তিনি সেই নির্দেশ পালনের জন্য করেন না, করেন তাঁর স্বভাববশত। দীর্ঘকাল ধরে তিনি এই ভাবে জীবনযাপন করেছেন বলে এই সমস্ত সদ্‌গুণ সদাচার তাঁর মধ্যে স্বতই স্ফুরিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে কিংবা জগতের কাছ থেকে কোন প্রাপ্তির আশা তাঁকে এই বিধিনিষেধ পালনে প্রবৃত্ত করে না।

অবশ্য তাই বলে যে তিনি বেদবিরোধী কর্ম করবেন তা নয়। ভৃত্য যখন প্রভুর আদেশ পালন করে, তা স্বতস্ফূর্ত নয়, তা দাসত্ব। ভক্ত সেইভাবে শাস্ত্র অনুসরণ করেন না। যিনি স্বভাবতই মহৎ, তাঁকে সৎ কাজ, সৎ আচরণ করার জন্য কোন প্রয়াস করতে হয় না, আপন সত্তার মহত্ত্ব থেকেই তা স্বত উৎসারিত হয়। তিনি শুভ কর্ম করেন না বা করবেন না,

তা নয় কিন্তু সেজন্য তাঁর শাস্ত্রাপেক্ষা বা লোকাপেক্ষার প্রয়োজন হয় না। এইটি মনে রাখতে হবে।

ভাগবতে একটি শ্লোকে এই তত্ত্বটি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে গোপীরা যখন তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের অনুরাগ পরীক্ষা করার জন্য প্রশ্ন করলেন, গভীর রাত্রে এই গহন জঙ্গলে তোমরা কেন এসেছ? প্রথমত, তোমাদের নিজ গৃহ থেকে এতদূর এসেছ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ভর্ৎসনা করবে এবং অপবাদ দেবে। তোমাদের উচিত তাদের কথা মেনে চলা ও গৃহকর্মে ব্যাপৃত থাকা। তা না করে তোমরা কর্তব্যে অবহেলা করেছ, এ অতি নিন্দনীয়। দ্বিতীয়ত, এই বনভূমি হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল। সুতরাং তোমাদের বিপদ ঘটতে পারে। অতএব তোমরা ফিরে যাও ও গৃহকর্ম সম্পন্ন কর। গোপীরা তার উত্তরে বলছেন, আমাদের মন তো গৃহকর্মেই ব্যাপৃত ছিল, কিন্তু তুমি তো সেই মনটি চুরি করেছ। আমাদের হাত দুটি তো কর্তব্য পালনেই নিযুক্ত ছিল কিন্তু সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে লোপ পেয়েছে। আমাদের চরণগুলি চলার শক্তিই হারিয়ে ফেলেছে। আমরা ফিরে যাব কিভাবে? আমাদের চলৎশক্তি নেই, হাত অনড়, কাজ করব কি করে? সুতরাং গৃহে ফিরবই বা কিভাবে আর ফিরে যদি যেতেও পারি, সেখানে গিয়ে করবই বা কি?

কী মর্মস্পর্শী এই বর্ণনা! মন যখন ভগবানে দৃঢ়ভাবে লগ্ন থাকে তখন শাস্ত্র বা সমাজ কারো নির্দেশ মেনেই কর্তব্যকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখা সম্ভব হয় না। সম্ভব যে হয় না তার কারণ এই নয় যে তিনি ইচ্ছাকৃত অবহেলা করছেন। তিনি আর তখন সে কাজের উপযুক্তই থাকেন না, তাঁর ক্ষমতাই থাকে না। যে মন দিয়ে কাজ করবেন সে মন তখন

ভগবানে লীন হয়ে গিয়েছে। আর মন যখন তাতে লীন হয়ে যায় অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিও তাদের কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, কারণ মনই যে তাদের নিয়ন্তা। গোপীরা এই কথাটাই কৃষ্ণকে বোঝাতে চেয়েছেন।

তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

অন্বয় ঃ চ (উপরন্তু) তস্মিন্ (সেই ভক্তিতে)* অনন্যতা (অপর সমস্ত কিছু হতে উপরতি বা একাভিমুখীনতা) তদ্বিরোধিষু (ঈশ্বরের বা ভক্তির বিরোধী বিষয়ে) উদাসীনতা (উপেক্ষা বা ঔদাসীন্য)।

অর্থ ঃ ভক্তিতে অন্যান্য সমস্ত কিছুই নিবৃত্ত হয়ে যায়। থাকে শুধুমাত্র অনন্যতা বা ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অভিমুখিনতা ও ভক্তিলাভের (ঈশ্বরলাভের) যা বিরোধী সেই সব বিষয়ের প্রতি উপেক্ষা।

ব্যাখ্যা ঃ আগেই বলেছেন যে, ভক্তি হচ্ছে নিরোধস্বরূপা বা নিবৃত্তিমূলা। কিসের থেকে নিবৃত্তি? এই নিবৃত্তির তাৎপর্যই এই সূত্রের আলোচ্য। এই নিরোধ বা নিবৃত্তির বিপরীত মেরুতে আছে অনন্যতা শব্দটি। এই অনন্যতা ঈশ্বর সম্বন্ধে। ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ততা, সম্পূর্ণ তদ্রূপতা, তন্মনস্কতা। অর্থাৎ মনে ঈশ্বর ভাবনা ব্যতীত অন্য কোন ভাবনা থাকবে না। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত অন্য কোন বৃত্তি তখন চিত্তে উপস্থিতই হবে না। এটি হলো একটা দিক। অন্য দিকে যা কিছু এর বিপরীত, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগের পথে যে কোন ধরনের বাধাবিঘ্ন, তাঁর আকর্ষণের যে কোন অন্তরায় তা দূর হয়ে যাবে। ভোগের বস্তুর প্রতি আমাদের মনের

---

* 'তস্মিন্' শব্দে ঈশ্বর না ভক্তি কি বোঝানো হয়েছে? ভক্তি হলে তস্যাম্ হতো না কি? সপ্তম সূত্রে তো ভক্তির সর্বনামীয় বিশেষণ 'সা' বলা হয়েছে?

একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ বা বিষয়াসক্তির সঙ্গে ঈশ্বরাভিমুখী মনের বিষম বিরোধ। সুতরাং যে মন ঈশ্বরকে লাভ করতে চায় সে মনকে অপর যে কোন বিষয়ে উদাসীন থাকতে হবে।

বৈরাগ্য বলতে কি বোঝায় সে কথা বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে কেবলমাত্র জগতের বিষয় থেকে মনটি তুলে নেওয়াই বৈরাগ্য নয়, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ থাকলে তবেই তা যথার্থ বৈরাগ্য। বিষয়বৈরাগ্যের সঙ্গে ঈশ্বরপ্রীতি না থাকলে তা ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলো না। কোন কারণে জীবনে হতাশা এলে মানুষের বিষয়বৈরাগ্য বা নির্লিপ্ততা আসতে পারে। কিন্তু যদি সে ঈশ্বরগত প্রাণ না হয় তবে তা ত্যাগ বা বৈরাগ্য নয়। আবার যদি এমন হয় মন ঈশ্বরাভিমুখী হলেও বিষয় সম্পর্কে তার ঔদাসীন্য নেই তবে বুঝতে হবে সে সম্পূর্ণ তদ্গতচিত্ত হতে পারেনি। যতটুকু সে বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, ঈশ্বরের পথে সেইটুকুই তার বিঘ্ন হয়ে রয়েছে। সুতরাং অনুরাগ ও বৈরাগ্য দুটি একসঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একটি ইতিবাচক, অপরটি নেতিমূলক। ইতিবাচক এই অর্থে যে চিত্তপ্রবাহ একাগ্র লক্ষ্যে একমাত্র ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হবে; এবং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের থেকে মনকে বিক্ষিপ্ত করে এমন যে কোন বিষয়ে তাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত হতে হবে। এটাই বৈরাগ্যের প্রকৃত অর্থ। এরই নাম উপরতি। আপাতভাবে উপরতি শব্দটি নিবৃত্তি-বোধক হলেও, তার অপরদিকটি প্রবৃত্তিমূলক। সেটি হচ্ছে ঈশ্বরানুরাগ। ঈশ্বরে অনন্যচেতা হওয়া। এই দুটির একত্র সমাবেশ হলেই তা হবে প্রকৃত রৈরাগ্য।

বৈরাগ্য বলতে সাধারণভাবে বিষয়বৈরাগ্য বোঝালেও শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের শিখিয়েছেন ও দেখিয়ে দিয়েছেন যে বিষয় ত্যাগ করলেই

বৈরাগ্য হয় না। তার ইতিবাচক দিকটি অর্থাৎ ঈশ্বরে ঠিক ঠিক ভালবাসার মাধ্যমে ত্যাগ ও অনুরাগের একত্র সমাবেশ ঘটলে তবেই তা প্রকৃত বৈরাগ্যের পর্যায়ে পড়ে। এর একটিকেও বাদ দেওয়া যায় না। বিষয় বাসনা ত্যাগ না হলে অনুরাগ আসে না, আর অনুরাগ না থাকলে ত্যাগ অর্থহীন।

ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য একমাত্র যোগ্যতার প্রয়োজন হলো অনন্যচিত্ততা। গীতাতে ভগবান বলছেন,

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥' (৯।২২)

—নিরন্তর অনন্যচিত্ত হয়ে যে ভক্ত আমাকে চিন্তা করেন, ভজনা করেন, আমাতে যিনি নিত্য যুক্ত আছেন সেই উপাস্য ভক্তের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করি। অর্থাৎ ভক্তের সমস্ত ভার ভগবান নিজেই গ্রহণ করেন। কিন্তু ভগবান ভার নেবেন এই আশাতে কি কেউ ভক্ত হতে চায়? না। প্রকৃত ভক্ত কিছুই আশা করেন না। এমনকি তিনি রক্ষা করবেন, এও তাঁর প্রার্থনায় থাকে না। তবে এ কেমন ভক্তি? এ ভক্তি শুধু দিতেই জানে, নিতে নয়। ভক্ত ভগবানকে তাঁর ভালবাসাটি নিবেদন করে কোন প্রতিদান চায় না। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'ভক্তিযোগ' বিষয়ক বক্তৃতায় বলেছেন—"ভালবাসার প্রথম লক্ষণ এই যে তাতে আদান-প্রদান বা লাভক্ষতির প্রশ্ন নেই। কিছু পাবার জন্য যখন একজন অপরকে ভালবাসে, জানবেন তা ভালবাসা নয় দোকানদারি মাত্র। যেখানে কেনাবেচার কথা সেখানে আর ভালবাসা নেই। অতএব যখন কেউ 'এটা দাও, ওটা দাও' বলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, জানবেন—তা ভালবাসা নয়। কি করে হবে? আমি তোমাকে আমার প্রার্থনা স্তবস্তুতি উপহার দিলাম, তুমি তার পরিবর্তে আমাকে কিছু দাও—এ তো দোকানদারি মাত্র।" (গৌণী ও পরাভক্তি;

ভক্তিযোগ; বা, র, ৪র্থ, পৃঃ ১৭৬) ভক্তি একতরফা বস্তু। ভক্ত তাঁর প্রেম, তাঁর অনুরাগ ভগবানের প্রতি সমর্পণ করে কিন্তু বিনিময়ে কিছু প্রত্যাশা করে না। ভক্ত দিতেই জানে, নিতে চায় না। এই-ই উত্তমা ভক্তি।

ভক্তির কষ্টিপাথর হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থপরতা ও নিষ্কামতা। ভগবানের কাছে ভক্তের এই কিছুই না চাওয়া নিঃসন্দেহে অতি কঠিন যোগ্যতার পরীক্ষা—কিন্তু এই ভূমিতে উত্তরণ না হলে প্রকৃত ভক্তও হওয়া যায় না। সামান্যতম প্রত্যাশাও যতক্ষণ থাকবে তা শুদ্ধা ভক্তি হবে না। উত্তম ভক্তের থেকে তা সামান্য নিচের ধাপ। এ বিষয়ে পরে আরও স্পষ্টভাবে বলা হবে।

এতক্ষণ কয়েকটি সূত্রের সাহায্যে ভক্তির স্বরূপ যা বর্ণনা করা হলো তার থেকে আমরা দেখছি যে, সকল বাসনার নিবৃত্তি হলে তবেই ভক্তিলাভ হয়। সুতরাং ভক্তিতে কোন কামনা-বাসনার স্থান নেই এবং এরই অনুসিদ্ধান্তরূপে বলা যায় যে সামাজিক বিধানে উক্ত কিংবা শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিহিত অবিহিত সমস্ত কর্মের ত্যাগই হলো নিরোধ শব্দের অর্থ। কেন না উপরোক্ত সমস্ত কর্মেরই উদ্দেশ্য কোন ফলপ্রাপ্তি বা বাসনা পূরণ। আর নিরোধের অর্থই হলো সব কিছুর সুনিশ্চিত পরিহার।

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা ॥ ১০ ॥

অন্বয় ঃ অন্য (ঈশ্বর এবং ভক্তি ভিন্ন) আশ্রয়াণাং (অপর যে কোন আশ্রয়ের) ত্যাগঃ (অবলম্বন না করাই) অনন্যতা (একনিষ্ঠা)।

অর্থ ঃ ঈশ্বর বা ঈশ্বরানুরাগ ভিন্ন অন্য যে কোন অবলম্বনকে পরিহার করাকে বলা হয় অনন্যতা বা একনিষ্ঠা।

লোকে বেদেষু তদনুকূলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা ॥১১॥

অন্বয় ঃ লোকে বেদেষু (জাগতিক ও বৈদিক তথা শাস্ত্রীয় নির্দেশসমূহের মধ্যে) তদনুকূল (যা ঈশ্বর প্রাপ্তি বা ভক্তিলাভের উপযোগী) আচরণং (সেই সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠান) তৎ বিরোধিষু (যা ঈশ্বর বা ভক্তি লাভের প্রতিকূল সেই সমস্ত কর্মের প্রতি) উদাসীনতা (নিস্পৃহতা) [ভক্তের কর্তব্য]।

অর্থ ঃ লৌকিক বা শাস্ত্রীয় যে সমস্ত কর্ম ভক্তিলাভের সহায়ক ভক্ত সেগুলি আচরণ করবেন। যা প্রতিকূল মনে হবে সেগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকবেন।

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয় ঃ নিশ্চয়দার্ঢ্যাৎ (বিশ্বাস দৃঢ় বা সুনিশ্চিত) ঊর্ধ্বং (না হওয়া পর্যন্ত) শাস্ত্ররক্ষণং (শাস্ত্র বাক্যের অনুসরণ) ভবতু (করা উচিত)।

অর্থ ঃ যতক্ষণ ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ শাস্ত্রবাক্য মেনে চলা প্রয়োজন।

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ অন্যথা (অন্যরূপ করা হলে) পাতিত্যাশঙ্কয়া (পতনের বা লক্ষ্যচ্যুত হবার আশঙ্কা)।

অর্থ ঃ অন্যথায় অর্থাৎ ভক্তিলাভের আগে এইসব কর্ম ত্যাগ করলে মূল আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবার সম্ভাবনা থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ এই চারটি সূত্রকে একত্রিত করে ভক্তিযোগে কর্মের স্থান কোথায়, এখন আমরা তাই দেখব। দশম সূত্রে অনন্যতা বা একনিষ্ঠার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর ব্যতীত যে কোন বিষয়ে ত্যাগ, তাঁকে পাবার সাধনা ভিন্ন যে কোন প্রচেষ্টা থেকে বিরতি, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর অগ্রহণ এরই নামান্তর অনন্যত্ব বা একনিষ্ঠতা। কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম বা শাস্ত্রীয় কর্ম পরিত্যাগের কথা বলা হলেও তা আক্ষরিকভাবে যে গ্রহণ করতে হবে তা নয়। তাই আবার বলছেন, শাস্ত্রে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে যেগুলি ভক্তিলাভের সহায়ক, যার দ্বারা ভক্তির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় সেগুলি পরিত্যাগ করতে হবে না। কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় বিধি নয়, প্রচলিত যে সমস্ত প্রথা ভক্তিলাভের অনুকূল সেগুলিও ত্যাগ করার দরকার নেই। কিন্তু যা ভক্তিলাভের পরিপন্থী সেইসব কর্মে আমাদের উদাসীন থাকতে হবে। সেইসব বিষয়ে কোন আসক্তি থাকা চলবে না। শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসরণ করার অর্থ বেদবিধির বিরুদ্ধাচরণ করা নয়। যে সমস্ত আচার পালনের দ্বারা আমাদের ভক্তির বৃদ্ধি হবে সেইগুলিই আমরা পালন করব। আর ভক্তিলাভের কোন সহায়ক নয় অথবা বিশেষ ভাবেই অন্তরায় সেইসব আচার পালনের ক্ষেত্রে আমরা উদাসীন থাকব, তা বৈদিক বা লৌকিক যে বিধিই হোক না কেন—এই-ই সূত্রের মর্মার্থ।

বেদে বহু বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। কি করলে স্বর্গ লাভ হয়, ধনসম্পদ বা সন্তান লাভ হয়, এমনকি পর্জন্যদেবকে প্রসন্ন করে কিভাবে বৃষ্টি হতে পারে ইত্যাদি বহু বিষয় লাভের পথই বেদে বলা হয়েছে। কিন্তু এসব বিষয়ে ভক্তের কোন আগ্রহ নেই। এ সমস্ত আচার তাঁর ভক্তিলাভে কোন সাহায্য করে না বলেই এগুলির দিকে তাঁর দৃষ্টি দেবার দরকার নেই। কিন্তু যদি এমন কোন আচার বা অনুষ্ঠান থাকে যা তাঁকে ভক্তির পথে আরও অগ্রসর করবে তা তিনি নিশ্চয়ই এড়িয়ে যাবেন না।

সূত্রে যে 'উদাসীনতা' বা 'পাতিত্যাশঙ্কা' শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে দেবর্ষি তা অতি সযত্নে সতর্কভাবে ভেবে ব্যবহার করেছেন। এক কথায় শাস্ত্রীয় বা লৌকিক বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা নয়, ভক্তির যা অনুকূল সেগুলিই ভক্তের গ্রহণীয় এই কথাটিই তিনি বলতে চেয়েছেন। উপরন্তু আরও সাবধান করে বলেছেন, ভক্তিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত এগুলি অবশ্য পালনীয়। কারণ তা তাকে ভক্তির পথে অগ্রসরই করবে। তবে একবার ভক্তি লাভ হলে ভক্ত এইসব বিধি নিষেধের অতীত হয়ে যান। সাধ্য বস্তু লাভ হলে আর সাধনের প্রয়োজন থাকে না।

আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক না হলেও শাস্ত্রবিধি সাধক ভক্তের কাছে পালন করা এইজন্য শ্রেয় যে তা তাকে অশুভ থেকে রক্ষা করে পবিত্র থাকতে সাহায্য করে। অন্যথায় এই সদাচার পালন না করলে তার বিপথগামী হবার, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার আশঙ্কা থেকে যায়। সেইজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য বস্তুর সঙ্গে শাস্ত্রীয় নির্দেশের সঙ্গতি থাকবে সাধক সেগুলি নিশ্চয়ই মেনে চলবেন।

বেদের বা শাস্ত্রের উপদেশ লঘুভাবে দেখার বিষয় নয়। তার থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য সেগুলি বাতিল না করে তাদের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় কেন, যতক্ষণ না ভক্তিলাভ হয় লৌকিক রীতিনীতিও আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা প্রয়োজন।

গীতাতে বলা হয়েছে, 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।' (৩।৫)—কর্ম না করে কেউ এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। সুতরাং কর্ম আমাদের প্রতি নিয়তই করতে হচ্ছে। তবে এটাই বিচার করার, যেসব কর্ম আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের উপযোগী আমরা সেগুলিই করব আর যা উপযোগী নয়, বরং ক্ষতিকর সেগুলি ত্যাগ করব। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের কর্ম ও অকর্মের বিচার।

লোকোঽপি তাবদেব ভোজনাদিব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি ॥১৪॥

অন্বয় ঃ লোকঃ অপি (লৌকিক আচরণও) তাবৎ এব (ততক্ষণ পর্যন্তই) ভোজনাদিব্যাপারঃ (আহারাদি কর্ম) তু (কিন্তু) আশরীরধারণাবধি (যতক্ষণ দেহ থাকবে)।

অর্থ ঃ (যতদিন না দৃঢ়াভক্তি লাভ হয়) ততদিন পর্যন্ত লোকবিধি অনুযায়ী কর্ম করে যেতে হবে। কিন্তু দেহরক্ষণার্থ যে ভোজনাদি কর্ম সেগুলি যতদিন এই শরীর থাকবে ততদিন পর্যন্ত করতে হবে।

ব্যাখ্যা ঃ পানভোজন শয়নাদি বা অঙ্গসঞ্চালনাদি যে সমস্ত জৈব ক্রিয়া আমাদের শরীর ধারণের জন্য প্রয়োজন হয় তা জীবনের শেষ দিন পর্যন্তই করতে হয়। যেমন যতক্ষণ শরীর আছে আহারের প্রয়োজন থাকবেই। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই একই কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত এই শরীর আছে ততক্ষণ তা রক্ষা করার জন্য এইসব ব্যাপার অত্যাবশ্যক। সুতরাং এগুলি বাদ দেওয়া বা অবহেলা করা চলে না, এই হলো সূত্রের মূল ভাব। তবে যদি প্রশ্ন ওঠে, 'জীবনরক্ষার বিষয় নিয়ে আমরা উদ্বিগ্নই বা হব কেন? দেহ যায় যাক তাতে ক্ষতি কি?' কিন্তু ক্ষতি আছে। কারণ এই শরীর আছে বলেই তো আমরা সাধন করতে পারি। শরীর যদি না থাকে আমরা ভক্তির অনুশীলন করব কার মাধ্যমে? অতএব আত্মহনন করা কোনক্রমেই উচিত নয়। শরীর রক্ষণাত্মক যেসব ক্রিয়া তা ত্যাগের অর্থই আত্মহত্যা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জীবনধারণের জন্য যে অত্যাবশ্যক বিধিনিয়ম, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব না। অনেক সময়েই দেখা যায় যে শরীর ভাল রাখার জন্য যে কতকগুলি অত্যাবশ্যক নিয়ম আছে

লোকে সে সম্বন্ধে প্রায়ই উদাসীন থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ এই ঔদাসীন্য সমর্থন করে না। স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বিশেষ আবশ্যক, যাতে শরীর সুস্থ ও সুগঠিত থাকে ও সাধন জীবনে কোন শারীরিক বাধা উপস্থিত না হয়। নিজের অবহেলা বা গাফিলতির জন্য শরীর রুগ্ন বা দুর্বল হয়ে পড়লে সাধকেরই ক্ষতি। তাঁর আধ্যাত্মিক অগ্রগতি তাতে ব্যাহত হবে। সুতরাং শরীর যাতে সুস্থ থাকে সেজন্য যত্ন করা কর্তব্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারবনিতার উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, সে যেমন নিজের শরীরের যত্ন নেয়, ভক্তও তেমনিভাবে শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখবে। বারাঙ্গনা জানে যে তার রূপলাবণ্যের ক্ষয় হলে তার জীবিকাও বন্ধ। ভক্তের শরীরও তেমনই যদি অপটু হয়ে যায় তাঁর সাধন-ভজন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেইজন্য দেহচর্চার সাধারণ নিয়মগুলি সযত্নে মেনে চলা প্রয়োজন। এই দেহের মাধ্যমেই আমাদের আত্মোপলব্ধির প্রয়াস করতে হয়। তাই তাকে ইচ্ছামতো অবহেলা করা চলে না। প্রায়ই লোকে উপবাস বা অন্যান্য কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। কিন্তু তার পরিণাম শুভ হয় না। কারণ যে যন্ত্রের দ্বারা আমাদের সাধনপথে অগ্রসর হতে হয় সেই যন্ত্রই তখন বিকল হয়ে পড়ে। এইজন্যই শরীরকে উপেক্ষা করতে নেই।

অনন্যতার প্রসঙ্গে ক্রমেই আমরা অন্য আলোচনায় এসে পড়েছিলাম। অনন্যানুরাগের অর্থই হলো ঈশ্বরে, কেবলমাত্র ঈশ্বরেই একাত্ম হয়ে বসবাস।

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ঃ তৎলক্ষণানি (ভক্তির লক্ষণাবলী) মতভেদাৎ (বিভিন্ন জনের মত অনুসারে) নানা (অনেক প্রকার) বাচ্যন্তে (বলা হচ্ছে)।

অর্থ ঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাকার বা প্রবক্তার মতানুসারে ভক্তির লক্ষণগুলি বলা হচ্ছে।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তিমার্গের কয়েকজন বিশিষ্ট আচার্যের মতবাদ এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এক একজন আচার্য ভক্তির এক এক রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সব কটি সংজ্ঞাই আমাদের চলার পথে সহায়ক। কেন না তাহলে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার ফলে ভক্তির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা আমরা পেতে পারি।

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্যঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয় ঃ পূজাদিষু (পূজা এবং তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়) অনুরাগঃ (প্রীতি ও আকর্ষণ) ইতি (ভক্তি এই কথা) পারাশর্যঃ (পরাশর পুত্র ব্যাসদেব বলেছেন)।

অর্থ ঃ ব্যাসদেবের মতে শাস্ত্রসম্মত পূজাদির প্রতি আকর্ষণ ও তার অনুষ্ঠানই ভক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ ব্যাসদেব পুরাণের রচয়িতা আর পুরাণাদির (এ সমস্ত পুরাণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাগবত। পুরাণসমূহে বৈধী পূজার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ প্রতিনিয়ত ঐসব অনুষ্ঠান করতে করতে ভগবানের প্রতি ভালবাসা আসবে। প্রবর্তকের পক্ষে তাই এটি বেশি প্রয়োজন, কেন না একেবারে গোড়ায় সেই পরম প্রেমের ধারণা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। পরমপ্রেমের তত্ত্ব ভক্তিপথের শেষের কথা, প্রারম্ভিক নয়।

কথাদিষু ইতি গর্গঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ঃ কথাদিষু (ভগবানের লীলাবিষয়ে) [ভক্তি অনুরাগ] ইতি (এই কথা) গর্গঃ (গর্গাচার্য) বলেন।

অর্থ ঃ মহর্ষি গর্গের মতে ভক্তির সংজ্ঞা—ঈশ্বরের নাম শ্রবণ ও কীর্তনের প্রতি অনুরাগ।

ব্যাখ্যা ঃ আচার্য গর্গের মতে বিভিন্ন অবতারে ভগবানের যেসব লীলাকাহিনী আছে সেই সব শ্রবণে আকর্ষণ ও অনুরাগই ভক্তির নামান্তর। ভক্তিমার্গের অন্যতম প্রবক্তা গর্গমুনির বক্তব্য যে 'কথা' অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ, যেমন বিভিন্ন অবতারে তাঁর নাম-ধাম-জন্ম-কর্ম-চরিত্র প্রভৃতির আলোচনায় প্রীতি ও ঔৎসুক্যই হচ্ছে ভক্তি। কেন না তাঁর নাম গুণ কীর্তনে, তাঁর বিভিন্ন অবতারের জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী শ্রবণে তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে।

আত্মরত্যবিরোধেন ইতি শাণ্ডিল্যঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয় ঃ আত্মরতি (আত্মার প্রতি প্রীতি) অবিরোধেন (আত্মরতির বিরোধী বস্তু ত্যাগ করে) ইতি (এই-ই ভক্তি) শাণ্ডিল্যঃ (শাণ্ডিল্য মুনির মত)।

অর্থ ঃ মহামুনি শাণ্ডিল্যের মতে ঈশ্বরকে নিজের আত্মারূপে জেনে সেই আত্মার প্রতি অনুরাগ এবং সেই অনুরাগের পথে বিঘ্নস্বরূপ যে বস্তু তার ত্যাগই হলো ভক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ দেবর্ষি নারদের মতে মহর্ষি শাণ্ডিল্য স্বয়ং একটি ভক্তিসূত্রের রচয়িতা। পূর্বোক্তদের তুলনায় তাঁর ভক্তির সংজ্ঞা স্বতন্ত্র।

তিনি বলেছেন যে আত্মাসম্বন্ধীয় প্রীতি ও আকর্ষণ তাই-ই ভক্তি। এই আত্মা বলতে সীমিত 'কাঁচা-আমি' নয়। ঈশ্বরই সর্বভূতের আত্মা। সেই পরমাত্মার প্রতি অনুরাগই ভক্তি। এই ভক্তি আমাদের সমস্ত জীবনে বিস্তৃত থাকবে। অর্থাৎ আমরা তখনই যথার্থ ভক্ত হতে পারব যখন আত্মরতির বিরোধী কোন অনুষ্ঠান আমাদের ভাবনায় বা কর্মে থাকবে না।

পূর্বোক্ত আচার্যদের সঙ্গে ঋষি শাণ্ডিল্যের পার্থক্য এইখানেই যে তাঁরা সাধনাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এখানে 'অবিরোধেন' শব্দটির দ্বারা বিপরীতক্রমে বলেছেন যে, যা ভক্তিলাভের পরিপন্থী নয়, যা ভক্তির হানি করে না এমন সব বস্তুর প্রতি অনুরাগই ভক্তি।

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্ বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি ॥ ১৯ ॥

অন্বয় ঃ নারদঃ (নারদের মতে) তু (কিন্তু) তদর্পিত অখিল আচারতা (ঈশ্বরে সকল কর্মের সমর্পণ) চ (এবং) তৎবিস্মরণে (তিনি স্মরণ পথে উদিত না হলে) পরম (তীব্র) ব্যাকুলতা (উদ্বেগ) ইতি (এই-ই ভক্তি)।

অর্থ ঃ দেবর্ষির মতে আমাদের সমস্ত ধর্মকর্ম ভগবানের চরণে সমর্পণ করা এবং কখনও মুহূর্তকালের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত হলে অন্তরে যদি তীব্র বিরহ ব্যাকুলতা দেখা যায় তাই-ই ভক্তি।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূত্রে নারদ তাঁর স্বকৃত (স্বীয়) ভক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন। আগের তিনটি লক্ষণ থেকে এটি সম্পূর্ণ পৃথক। তিনি বলছেন, আমাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় কর্ম সবই ঈশ্বরে সমর্পণ করার নামই ভক্তি। সেই সঙ্গে ভক্তির দ্বিতীয় লক্ষণ—যদি তাঁকে কোন সময় ভুলে যাই তবে

তীব্র বেদনা জাগবে অন্তরে। তাহলে, এই ভক্তির প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, আমরা যা কিছুই করি না কেন তা তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করব অর্থাৎ সমস্ত কর্মই হবে তাঁরই পূজা।

এমনকি আমাদের অতি সাধারণ স্বাভাবিক নিত্য কর্মও এর অন্তর্গত। তুচ্ছ বৃহৎ সব কিছুই তাঁকে সমর্পণ করা। আর কেবলমাত্র সমর্পণই শেষ কথা নয়। তাই দ্বিতীয় শর্তে ভক্তকে সচেতন করে বলছেন, যদি তাঁকে ক্ষণিকের জন্যও বিস্মৃত হই, তখন যেন এই বিস্মৃতির জন্য অন্তরে তীব্র জ্বালা অনুভব করি। সেই অবস্থা যখন স্বতই আসবে, তাকেই বলছেন ভক্তি। যখন আমরা তাঁকে ভুলে থাকি, তাঁর থেকে দূরে থাকি তখনই ভক্ত অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন। তাঁর অদর্শনে এই যে তীব্র অন্তর্জ্বালা তার নিদর্শন আমরা গোপীদের আচরণে দেখি। ভাগবতে এমনি এক বর্ণনা আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সকাল থেকে গোচারণে ব্যাপৃত, ফলে গোপীরা সারাদিন তাঁর দর্শন পাননি। সন্ধ্যায় যখন তিনি ফিরছেন তখন গোপীদের আকাঙ্ক্ষা তিনি যেন এক লহমার জন্যও চোখের আড়াল না হন, তাই চোখের পলক পড়লেও তাঁরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। কারণ সেই মুহূর্তটি যে বৃথা চলে যাচ্ছে। তাই তাঁরা বিধাতার কাছে এই বলে অনুযোগ করছেন যে ভক্তের কাছে প্রিয়তমের অদর্শন জনিত দুঃখ যে কত গভীর এক লহমার জন্য চোখের একটি পলকই যে তাঁদের কাছে এক যুগের সমান, বিধাতা পুরুষের তার কোন ধারণাই নেই। এই যে তীব্র অনুরাগ এই হচ্ছে প্রকৃত ভক্তির পরীক্ষা।

দেখা যাচ্ছে, দেবর্ষি তার ভক্তির সংজ্ঞার্থে দুটি বিষয় বলছেন। প্রথমত, যতদিন আমাদের এই পার্থিব শরীর থাকবে আমাদের সমস্ত কর্ম তাঁর সেবায় তাঁর তৃপ্তিবিধানের জন্য তাঁরই উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হবে।

দ্বিতীয়ত, কোন সময় যদি তাঁকে মনে না পড়ে তবে পরে তার জন্য দুঃসহ বেদনা অনুভূত হবে। এরই নাম ভক্তি। তাই ভক্তি যে সর্বতোভাবে সুখদ তা নয়। আমরা ভুল করে ভাবি যে ভাক্তিতে বুঝি অবিমিশ্র আনন্দ। তা নয়। ভক্তিতে অলৌকিক আনন্দের মধ্যে আছে অপার বেদনা। এই আনন্দ ও বেদনা দুটিই অতুলনীয়। ভক্তের জীবনে এ দুটিরই চরম অনুভূতি হয়। যখন তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তখন তাঁর সমস্ত কর্ম হয় তাঁরই উদ্দেশে। তিনি তখন হৃদয়ে উল্লাস অনুভব করেন। কিন্তু যদি কোন সময়ে তাঁর মন ঈশ্বরে লগ্ন না থাকে তারপরই তিনি বেদনায় বিহ্বল হন এই বিস্মৃতির জন্য। আর সাধকের জীবনে এ জোয়ার-ভাঁটা ঘটেই থাকে। এতে অস্বাভাবিকত্ব কিছু নেই। বিচ্ছেদের সময় তাঁর যে তীব্র যন্ত্রণা, তার সঙ্গে কোন দুঃখের তুলনা চলে না। ভক্তের জীবন আনন্দ ও বেদনার সংমিশ্রণ। কিন্তু দুটির সংবেগই তীব্রতম। নারদকৃত ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ এই।

এমন ভক্ত যিনি তাঁর আর বৈধী জপধ্যানের পৃথক প্রয়োজন থাকতে পারে না। কারণ তখন তিনি সম্পূর্ণভাবে তদ্‌গতপ্রাণ। সেইজন্য তখন তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের অতীত। ভাগবতে কপিল—দেবহূতি সংবাদে কপিল ঋষি তাঁর মাকে সাধন সম্পর্কে কিছু অনুশাসন প্রসঙ্গে ভক্তিসাধনায় কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় আচার-আচরণকে নির্দেশ করে বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম পালনই ধর্ম। সে কর্ম দৈনন্দিন নিত্যকর্ম বা বিশেষ কোন কারণোদ্ভূত কর্ম যা-ই হোক না কেন। ভগবানের উদ্দেশে স্তোত্রাদি পাঠ এবং অপরের যাতে ক্ষতি না হয় সেই সমস্ত হিংসারহিত কর্মই আমাদের করণীয়। তিনি সর্বভূতে বিরাজিত এইভাবে ঈশ্বরকে চিন্তা করতে হবে। সৎসঙ্গ এবং মহান আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন অতি আবশ্যক। দীন ব্যক্তিদের প্রতি থাকবে

দয়া ও করুণা। সমপর্যায়ের ব্যক্তির সঙ্গে থাকবে মৈত্রী। ইন্দ্রিয়দমন ও চিত্তসংযম ভক্তের অত্যাবশ্যক ধর্ম। ঈশ্বরের গুণকীর্তনে ও তাঁর মহিমা শ্রবণে ভক্ত সর্বদা অবহিত থাকবেন। ভক্ত হবেন সৎ, সরল, অনহঙ্কারী ও বিষয়ের প্রতি উদাসীন। এই সব সাধনার ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁর নাম শ্রবণ মাত্র মন তাঁতেই লীন হয়।

অস্ত্যেবমেবম্ ॥ ২০॥

অন্বয় ঃ এবম্ এবম্ (এইরূপই) অস্তি (হয়)।

অর্থ ঃ অনেক ভক্তের জীবনে ভক্তির এইরকম প্রকাশই দেখা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ আগের চারটি সূত্রে ভক্তির সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন পূজনীয় আচার্যের মতামত জেনেছি। নারদ স্বয়ংও তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণ ও ঈশ্বর বিরহে তীব্র ব্যাকুলতাই তাঁর মতে প্রকৃত ভক্তি। বর্তমান সূত্রে সেই প্রসঙ্গেই তিনি বলছেন যে ভক্তের জীবনে সত্য সত্যই এ রকম ঘটে। এ শুষ্ক তত্ত্বমাত্র নয়, এ যে শুধু কথার কথাই নয়, তিনি তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করেছেন পরবর্তী সূত্রে।

যথা ব্রজগোপিকানাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয় ঃ যথা (যেমন) ব্রজগোপিকানাম্ (ব্রজধামের গোপীগণের)।

অর্থ ঃ যেমন ব্রজগোপীদের জীবনে দেখা যায়।

ব্যাখ্যা ঃ বৃন্দাবনধামে গোপীদের জীবনে দেখি যে তাঁদের সমস্ত জীবনই ছিল শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত। নিজেদের পৃথক সত্তা যেন তাঁদের ছিল না। তাই সামান্যতম সময়ের জন্য যদি শ্রীকৃষ্ণ অদর্শন হতেন বা তাঁরা তাঁকে দেখতে না পেতেন, তাঁদের দুঃখের সীমা থাকত না।

ন তত্রাপি মাহাত্ম্যজ্ঞান-বিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২॥

অন্বয় ঃ তত্র অপি (সেক্ষেত্রেও) মাহাত্ম্যজ্ঞান (ভগবানের মহিমা জ্ঞানের) বিস্মৃতি অপবাদঃ (স্মরণ না থাকা রূপ অপবাদ) (দোষ) ন (ছিল না)।

অর্থ ঃ ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণগতপ্রাণা হলেও তাঁর মাহাত্ম্য বা ভগবৎসত্তা কিন্তু কখনও তাঁরা বিস্মৃত হননি।

ব্যাখ্যা ঃ কেবলমাত্র তত্ত্বকথায় হৃদয় বুঝ মানে না। তাই ঋষি এখানে ব্রজরমণীদের প্রেম ভক্তির কথা বলছেন, উদাহরণ হিসাবে যা অনন্য। দৃষ্টান্ত সার্থক হলে তত্ত্ব সহজবোধ্য হয় আর গোপীরা হলেন ভক্তের শিরোমণি। ভক্তের অনুভূতি কেমন হবে তা বোঝা যায় এই গোপীদের জীবন থেকে।

ভাগবতে বর্ণনা আছে যে এই গোপীরা সর্ববস্তুতেই কৃষ্ণকে দেখতেন। অন্য কিছু তাঁরা দেখতে পেতেন না। তাঁদের সমস্ত জীবনই ছিল কৃষ্ণময়। তাঁদের যা কিছু কর্ম তার কেন্দ্রে ছিলেন কৃষ্ণ। এক মুহূর্তেরও কৃষ্ণ বিরহ তাঁদের কাছে মৃত্যুর চেয়ে মর্মান্তিক।

কিন্তু এখানে একটি অপবাদ আশঙ্কা থাকে যে গোপীরা তাঁদের পরম প্রেমাস্পদের মাহাত্ম্য, তিনি যে পরমেশ্বর—সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। কৃষ্ণরূপী ব্যক্তিকে তাঁরা ভালবেসেছিলেন নিজেদের উজাড় করে, কিন্তু তাঁর ঈশ্বরীয় সত্তা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল।

তদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩॥

অন্বয় ঃ তৎ (সেই জ্ঞান) বিহীনং (ব্যতিরেক) ইব ([ভালবাসা] যেন) জারাণাম্ (উপপত্নীদের মতো)।

অর্থ ঃ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরবোধে না জেনে ব্যক্তিরূপে ভালবাসা তো উপপতির প্রতি ভালবাসা।

ব্যাখ্যা ঃ এই অপবাদ যে সত্য নয়, পূর্বসূত্রে সেইজন্যই নারদ 'ন' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। গোপীদের প্রেম সম্বন্ধে এ অভিযোগ ওঠা সম্ভবই নয়। তাঁরা তাঁদের জীবনের একমাত্র প্রিয়তম জনের প্রকৃত মাহাত্ম্য জানতেন না— একথা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। সেই পরম সত্যটি যদি তাঁদের জানা না থাকত তবে তা প্রেম হতো না। তা হতো পরপুরুষের প্রতি নারীর পার্থিব কামনা মাত্র। ঈশ্বরবোধবিহীন ভালবাসা ভক্তির দৃষ্টান্ত হতে পারে না। তা কামনাপূর্ণ জাগতিক ভালবাসা।

নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্ ॥ ২৪ ॥

অন্বয় ঃ তস্মিন্ (সেই পার্থিব ভালবাসায়) তৎসুখ (প্রিয়জনের সুখে) সুখিত্বম্ (সুখবোধ) নাস্তি এব (নাই-ই)।

অর্থ **ঃ** এই নিম্নস্তরীয় পার্থিব ভালবাসায় প্রিয়জনের সুখই যে নিজের সুখ এই বোধ থাকে না।

ব্যাখ্যা ঃ গোপীরা কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন সেই আলোচনার সূত্রটি এখানে আবার তুলে ধরা হচ্ছে।

ভাগবতের মূল ভাব হচ্ছে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যথাযথই জানতেন, কিন্তু সে তত্ত্বকে তাঁরা প্রাধান্য দিতেন না। গোপীরা তাঁকে আপনজন বলে জানতেন আর সেই জন্যই তাঁর মাহাত্ম্যের দিকটা তাঁরা মনে আসতে দিতেন না। লৌকিক একটা দৃষ্টান্ত ধরা যাক। কোন মায়ের সন্তান সমাজে উচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, জনসমাজে অসাধারণ মহৎ বলে গণ্য। কিন্তু মা-ও কি সন্তানকে সেইভাবে দেখবেন? এমন নয় যে, মা তাঁর ছেলেটির গৌরবের কথা জানেন না, কিন্তু সব জেনেও তিনি তাঁকে নিজের সন্তানরূপেই ভালবাসেন। বিখ্যাত ব্যক্তিরূপে নয়।

গোপীদের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল। তাঁরা জানতেন শ্রীকৃষ্ণ কত মহান, কিন্তু তাঁদের কাছে সে মহত্ত্বের অত মূল্য ছিল না। তাঁরা তাঁকে ভালবাসতেন তাঁরই জন্য—তিনি পরমৈশ্বর্যবান বলে নয়। যদিও সে মূল সত্য তাঁদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। তাই গোপীগীতায় তাঁদের কণ্ঠে শুনি—"আমরা জানি তুমি কোন সাধারণ ব্যক্তি নও। তুমি কেবল গোপীদের আনন্দস্বরূপ নও। তুমি সকল প্রাণীর অন্তর্যামী নিয়ন্তা। প্রত্যক্ষরূপে তুমি সমস্ত জীবকে নিয়ন্ত্রণ করছ। বিশ্বের পালনের জন্য সৃষ্টিকর্তা তোমাকে আহ্বান করেছিলেন। তাই তুমি যদুকুলে জন্ম নিয়েছ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুমিই একমাত্র সৎ বস্তু—তুমিই পরম সত্য। আর তোমার প্রতি প্রেমবশতই (আমরা) তোমাকে আমাদের নয়নের মণি বলে মনে করি।"

এই প্রসঙ্গে আরও একটি আপত্তিও উঠতে পারে। আমরা জানি যে আসক্তি মানেই বন্ধন—সুতরাং সর্বপ্রকার আসক্তিই ত্যাগ করা দরকার। এখন গোপীরা যে এমন ভাবে কৃষ্ণসত্তা লাভ করেছেন সেও ভক্তের পক্ষে বন্ধনের কারণ। অতএব সে আসক্তিও ত্যাগ করা উচিত। গোপীপ্রেম তবে কেমন করে প্রশংসার হতে পারে? এ রকম আচরণ কখনও ভক্তের পক্ষে আদর্শ হয়?

খুবই সঙ্গত প্রশ্ন। আসক্তি যে বন্ধনের হেতু এ তো সাধারণ (সহজ) অভিজ্ঞতাতেই বোঝা যায়। যার প্রতিই হোক না কেন আসক্তি মাত্রেই জীবকে বদ্ধ করে। গোপীরা যদি কৃষ্ণে অনুরক্ত হন তা অবশ্যই তাঁদের বন্ধনের কারণ হবে। আর সে রকম অনুরাগ তাহলে কখনও আদর্শ হতে পারে না। এখন বুঝতে হবে যে যাঁরা এই সংশয় উত্থাপন করেছেন তাঁরা কিন্তু এই পরম প্রেমের আস্বাদন কোনদিনও করেননি। তাঁরা অনুরাগকে সামান্যীকরণ (সাধারণীকরণ) করে ভাবছেন যে সমস্ত প্রেমই জীবকে বদ্ধ করে। এইখানেই নারদ বলছেন যে ভগবৎ প্রেম বিশেষ বস্তু। তা কখনই ত্যাগ করতে বা এড়িয়ে চলতে হয় না। এই প্রেম জীবকে সংসারে বদ্ধ করে না। এ প্রেমের পাত্র স্বয়ং কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ নন, স্বয়ং ভগবান। সুতরাং সাধারণ ক্ষেত্রে যা বন্ধন, এ ক্ষেত্রে তা নয়। তবু যদি প্রশ্ন ওঠে অন্যান্য ক্ষেত্রে যা ঘটে, কৃষ্ণের ক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? তবে তার উত্তরে একটি দৃষ্টান্ত দেখানো যায়—যখন আমরা কোন পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হই তখন কি ঘটে? আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে তাঁর পূতসঙ্গ আমাদের মনকে একটা উচ্চভূমিতে নিয়ে যায়। এই যে আকর্ষণ, এর দ্বারা বন্ধন হয় না বরং উত্তরণ ঘটে। কৃষ্ণ দিব্য পুরুষ একথা যদি নাও মানি, তবু

তাঁর মাহাত্ম্য গোপীদের পতনের কারণ না হয়ে উন্নতির কারণ হবে। যেমন সৎ সঙ্গে মানুষ পবিত্র হয় তেমনই।

গোপীরা কৃষ্ণের মহত্ত্ব সম্বন্ধে হয়তো সর্বদা সচেতন না-ও থাকতে পারেন কিন্তু তিনি মহান বলেই তাঁর প্রতি আকর্ষণের ফলও মহৎ হবে। [মন্দ ও ভাল দুটিই সমান সংক্রামিত (ছোঁয়াচে - infectious)। অসৎ মানুষের সঙ্গে-র ফলে তার অবগুণগুলি আমাদের মধ্যে যেমন সংক্রামিত হয়, সৎসঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমনি। এর কারণ বস্তুধর্ম।] মহৎ সঙ্গের মতোই এই কৃষ্ণপ্রেমও গোপীদের কল্যাণসাধনই করে—তাঁদের মুক্ত করে। কিসের থেকে মুক্তি? এই দেহের বন্ধন থেকে। জগতের বন্ধন থেকে, সাধারণ মানবোচিত সমস্ত কামনা বাসনা থেকে।

কিন্তু যদি এটি আসক্তিই হয় তবে অন্য আসক্তি থেকে কোথায় এর বৈশিষ্ট্য? যা বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তির কারণ হয়? নারদ বলছেন, এই প্রেমের গভীরে প্রবেশ করতে না পারলে সে বৈশিষ্ট্যটি দৃষ্টির অন্তরালেই থেকে যাবে। যে আসক্তি বন্ধনের হেতু হয়, যা আমাদের মনকে নিচের দিকে আকর্ষণ করে সে আকর্ষণের মূল লক্ষ্য না কোন বস্তু, না কোন ব্যক্তি। তার মূল লক্ষ্য সে নিজেই। আমরা যখন কোন ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হই বা বলি তাকে ভালবাসি তখন প্রকৃত ঘটনা হলো আমি নিজেই খুশি হই তার সঙ্গ লাভ করে। এ ভালবাসা নিঃস্বার্থ হয় না। পার্থিব সমস্ত ভালবাসাতেই থাকে এই স্বার্থের গন্ধ। আত্মসুখই আমাদের লক্ষ্য। তাই যে বস্তু বা যে ব্যক্তির সঙ্গ আমাকে সুখ দেয় তাকেই আমি পেতে চাই। অপর দিকে ভক্তের লক্ষ্য কি? এই আত্মসুখে তার ভালবাসা তৃপ্ত নয়। নারদ বলছেন, পরাভক্তির প্রধান লক্ষণই হচ্ছে তা নিজের সুখ চায় না, চায় প্রেমাস্পদকে সুখী করতে।

পার্থিব ভালবাসায় আজ যে আমার প্রীতির পাত্র কোন কারণে কাল তার সম্বন্ধে অসন্তুষ্টি দেখা দিলে এই পার্থিব ভালবাসা বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এর সার্থক দৃষ্টান্ত একটি পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। মেয়েটি আপাতভাবে ছেলেটি সম্বন্ধে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ, কিন্তু যদি কোন কারণে তার ভালবাসা প্রত্যাখ্যাত হয়, তার প্রেম তখন পর্যবসিত হয় ঘৃণায়। এর তাৎপর্য কি? তাৎপর্য (হচ্ছে) এই যে, প্রিয়পাত্রকে সুখী করা তার লক্ষ্য ছিল না, তাকে উপলক্ষ করে সে চেয়েছিল নিজে আনন্দ উপভোগ করতে। এ আনন্দ-লিপ্সা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থযুক্ত এবং আনন্দে বাধা ঘটলেই তার মন হয় সঙ্কীর্ণ এবং ভালবাসা রূপান্তরিত হয় চরম বিদ্বেষে।

দিব্য প্রেমের ক্ষেত্রে এমন কখনও হয় না। কারণ সেখানে নিজের সুখ লক্ষ্য নয়, প্রেমাসম্পদকে সুখী করাই লক্ষ্য। সম্পূর্ণ আত্মবিলোপই পরাপ্রেমের প্রধান শর্ত। ভক্ত যখন ভগবানকে ভালবাসেন তিনি প্রতিদানে কিছু চান না, চান নিজের বলে যা কিছু আছে সব উজাড় করে দিয়ে দিতে। পার্থিব ভালবাসা যত মহৎ, যত তীব্রই হোক—এই নিঃস্বার্থতাকেই পরাপ্রেমের থেকে পৃথক করে রেখেছে।

সংসারেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই স্বাথহীন ভালবাসা কিয়দংশে যে দেখা যায় একথা কেউ কেউ বলতে পারেন। তার উত্তরে বলব, হ্যাঁ যায়। কিন্তু গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে ক্রমাগতই যদি তা প্রতিহত হতে থাকে, প্রতিদান না পাওয়া যায় তা অবশেষে বিরূপতার কারণ হয়ে ওঠে। তখন আশঙ্কা থাকে আসক্তির স্থান নেবে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষ।

এর থেকেই একথা স্পষ্ট হয় যে এই সাংসারিক প্রীতির ক্ষেত্রে এমন একটা কিছুর অভাব আছে যা দিব্য প্রেমে নেই। সেটি হলো প্রতিদান

পাওয়ার যে ইচ্ছা, তার অভাব। সাংসারিক প্রেম প্রতিদান প্রত্যাশী, আর দিব্যপ্রেম চায় শুধু নিঃশেষে সব দিতে।

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এক ধর্মসভায় গিয়েছিলেন। সেখানে কীর্তন ও ভক্তিমূলক গানের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রধানত ছিল, শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বিষয়ক পালাগান। চন্দ্রাবলী নামে অপর এক গোপীর কাছে কৃষ্ণ গিয়েছেন, তাই শ্রীমতীর মান হয়েছে—এই হলো বিষয়। সখীরা শ্রীমতীকে বলছেন, ''মান কেন করলি? তবে তুই বুঝি কৃষ্ণের সুখ চাস না।'' শ্রীমতী বলছেন, ''চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবার জন্য নয়। সেখানে যাওয়া কেন? সে যে সেবা জানে না।'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৮৭) এখন, শ্রীরাধা যিনি নিঃস্বার্থ প্রেমের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, তিনি এই কথা বলছেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর কাছে গিয়েছেন সেজন্য তাঁর অভিযোগ নেই। তাঁর দুঃখ চন্দ্রাবলী সেবা করতে জানে না। কৃষ্ণের যে কষ্ট হবে। শ্রীরাধার এই যে মনোভাব শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার এটি উল্লেখ করতেন। (দৃষ্টান্তটি কারও কাছে অশোভন বলে মনে হলে আমি দুঃখিত। কিন্তু এটি মানুষের সূক্ষ্ম [স্পর্শকাতর] অনুভূতির একটি দৃষ্টান্ত।)

এই যে মনোভাব এর পশ্চাতে আছে এক সূক্ষ্ম অনুভূতি। তাই এর আলোচনা করতে হবে কি প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। যেহেতু আমাদের এই দিব্যপ্রেমের কোন ধারণাই নেই তাই অতি সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে। গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ তার সবটাই অপার্থিব, অথচ আমাদের আলোচনা করতে হবে পার্থিব পরিবেশেই, তাই বলছি এই আলোচনায় অত্যন্ত সাবধানতার প্রয়োজন।

কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের সম্বন্ধে নয়, বিশ্বের অন্যান্য মরমিয়া সাহিত্যেও এই অপার্থিব প্রেমের বর্ণনা আছে। বিশেষত খ্রীস্টীয়

সাহিত্যে এই ধরনের অনুভবের অনেক বর্ণনা দেখা যায়। আমাদের প্রচলিত ভাষায় এই অনুভবের বর্ণনা করতে গিয়ে যাতে ভাবের কলুষতা না হয় তাই আমাদের শব্দচয়ন যেমন সতর্কভাবে করতে হবে তেমনি শব্দের ব্যঞ্জনার দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে, যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের কথা বলা হচ্ছে তা ভাষা ছাড়া ব্যক্ত করার অন্য পন্থা নেই। অথচ সেই ভাষা হয়তো লৌকিক বিচারে অশোভন ঠেকতে পারে। কিন্তু যিনি ঈশ্বরের আপনজন তাঁর কাছে এসব শোভনতা, অশোভনতা কিছুই নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের একটি ঘটনায় বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। একদিন ঘোড়ার গাড়িতে করে যাবার সময় একটি মদের দোকানের সামনে দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। কয়েকজন মত্ত ব্যক্তি সেই দোকানের আশেপাশে নানা অঙ্গভঙ্গি করছিল। তিনি কিন্তু সেই দৃশ্য দেখে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। মদ বা মাতলামির কথা তাঁর মনে এল না, এই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে উদিত হলো দিব্য আনন্দে মত্ত এক ঈশ্বর প্রেমিকের রূপ, তাই তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। সাধনার ফলে অনুভবযন্ত্র যে মন তা যখন সূক্ষ্ম ও অতি পবিত্র হয়, তখন যে কোন পার্থিব উদ্দীপনও তাকে দিব্যভাবে উপনীত করতে পারে। কোন আপাত অশালীন দৃশ্য বা শব্দও তাঁদের কাছে কদর্যতা প্রকাশ করে না। সুতরাং আমরা যখন এই দিব্য প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হব আমাদেরও মনের চারিদিকে প্রহরা রাখা দরকার। যেন এই সীমিত শক্তিবিশিষ্ট শব্দ বা ভাষা আমাদের মনকে নিচে না নামিয়ে দেয়। এ বিষয়ে আমি এত জোর দিচ্ছি কারণ মনে রাখতে হবে আমরা সাংসারিক প্রেমের কথা বলছি না। আমাদের প্রসঙ্গ ঈশ্বরকেন্দ্রিক।

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের প্রেমের উল্লেখ করেছেন। "সাধারণী প্রেম—নিজের সুখ চায়, তুমি সুখী হও আর না হও, যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। আবার সমঞ্জসা—আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা। সকলের উচ্চ অবস্থা—সমর্থা। যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণ সুখে সুখী, তুমি সুখে থাক, আমার যাই হোক। গোপীদের এই ভাব বড় উচ্চ ভাব।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৮১৮) রাধার ছিল প্রেমের এই সর্বোচ্চস্তরের অবস্থা। কৃষ্ণ-সুখেই তাঁর সুখ।

দিব্য প্রেমে স্বার্থ প্রণোদিত কোন উদেশ্য থাকে না। আর তার বিপরীতে লৌকিক প্রেমে প্রিয়জনকে সুখী করে সুখ লাভ করার যে মনোভাব, তা থাকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। প্রথম ক্ষেত্রে নিজের কোন চাহিদাই থাকে না। একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের ভালবাসার পাত্রকে সুখী করা, তাকে আনন্দ দেওয়া। শুদ্ধ প্রেমের এই হলো লক্ষণ। গোপীপ্রেমের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বলতে চেয়েছেন। এই পরাপ্রেমে দুটি বোধ কাজ করে। মমত্ববোধ ও আমিত্ববোধ। আমি তাঁকে ভালবাসি এবং তিনি আমার। ভক্ত যেন ভগবানের সঙ্গে এক অবিচ্ছিন্ন বন্ধনে যুক্ত থাকেন, তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না। এই 'আমি'কে ঠাকুর বলছেন 'পাকা আমি', 'ভক্তের আমি'। আর মমত্বের অর্থ ভগবান আমার। প্রথমটি অহং কিন্তু দিব্য অহং। যদি আমি তাঁর সেবা না করি তবে যে তাঁর সুখ হবে না। তাঁর এই চিন্তাধারাই আমাদের পরিচিত অহঙ্কারী ব্যক্তি থেকে তাঁকে পৃথক করেছে। আর 'ঈশ্বর আমার' এই বোধের ফলে ভক্তের সমস্ত ভালবাসা তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছে। জগতে দেখা যায়, আমরা যাকে নিজেদের প্রিয় বলে মনে করি তাঁর প্রতি আমাদের সর্বক্ষণই অখণ্ড মনোযোগ থাকে। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ আর একটি কথা বলেছেন যে যদি

প্রিয়জনের দেবত্ব বা ঐশ্বর্য সর্বদা আমাদের মনে জাগরূক থাকে তবে কিন্তু বাৎসল্য বা মধুর রসে তাঁকে সেবা (ভজনা) করা সম্ভব হয় না। বাৎসল্য বা মধুর রতির মধ্যে যে কোমল স্নেহের ভাব তার বিকাশ হতে পারে না যদি মনের মধ্যে সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে সর্বদা ঐশ্বরিক মহিমা সজাগ থাকে। সে সজাগতা ভালবাসার নিবিড়তা ও তীব্রতাকে ক্ষুণ্ণ করে। তাই তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তিনি ঈশ্বর—এ সচেতনতা যে থাকবে না তা নয়, গোপীদের ক্ষেত্রেও তা ছিল। ভক্ত ভগবানের মধ্যে এই প্রেমের সম্বন্ধটি হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের একটি অতি সুকোমল ভাব, আর সেইজন্যই এত স্পর্শকাতর যে, ভাষায় একে ব্যাখ্যা করা সাধ্যাতীত। —যে বোঝে সে বোঝে। তেমনি প্রেমিক ভক্ত ছাড়া অন্যের পক্ষে এ প্রেম ধারণায় আনা সম্ভব নয়। আমাদের মন যতটা ভগবৎপ্রেমের এই উচ্চ ব্যঞ্জনায় অনুরণিত হয়, ততটাই এর মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধি হতে পারে। অন্যথায় সাধারণ লোকের কাছে ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় নিছকই উপহাসের বিষয়, বিদ্রূপের খোরাক।

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের এই অলৌকিক লীলাকে বর্ণনা করতে হয়েছে লৌকিক ভাষাতেই। আর সেই জন্যই এই ভাবজগতের সঙ্গে যাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় নেই তারা সমস্ত ব্যাপারটাই ভাবে নিন্দনীয়। বোঝবার বিভ্রমের জন্য, সমানানুভূতির অভাব থাকার জন্য তারা মনে করে আধ্যাত্মিক চরম অনুভূতির উপায় বুঝি এই পরকীয়া রতি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অন্যত্রও মরমিয়া সাধকরা ভগবানের সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ কেমন তা বহু ক্ষেত্রে বর্ণনা করেছেন। খ্রীস্টীয় সাধকরা নিজেদের নারীরূপে ও ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁদের সাহিত্যে জীবাত্মা সর্বদাই নারী এবং ঈশ্বরের সঙ্গে ঘটে তাঁর দিব্যপ্রেমের

লীলা। পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে অনুরাগ তা যখন দিব্য হয়, তখন সেটাই হয় প্রেমের জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি। সাধারণ লোক লৌকিক প্রেমের মধ্যে তারই একটা আভাস পায় মাত্র। আভাস বলছি এইজন্য যে এই প্রেমে কোন দৈহিক সম্বন্ধ নেই, যা আছে লৌকিকে। এটি এমন এক সূক্ষ্ম স্তরের অনুভূতি যার সবটাই আধ্যাত্মিক। সর্বতোভাবে দেহেন্দ্রিয়াতীত।

এই তত্ত্বটি মনে না রেখে যদি এই লীলাকাহিনী বিষয়ক শাস্ত্র আমরা পড়তে যাই তাতে কিন্তু সুফলের চেয়ে কুফলের সম্ভাবনাই অধিক। সেই জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ এইসব দিব্যলীলার কাহিনী সাধারণ ভক্তদের পড়তে নিষেধ করতেন। কেন না তাদের অতি পরিচিত কামগন্ধযুক্ত যে অনুরাগ তাই-ই এই কাহিনীর ভাষার মাধ্যমে উদীপ্ত হতে পারে। মন থেকে কাম ভাব বিদূরিত হয়ে মন শুদ্ধ হলে পরে তবেই এই অপার্থিব তত্ত্ব অনুধাবন করে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করা ভাল।

সাধারণ ভক্তদের জন্য অন্য পথ খোলা আছে। ভগবানকে পিতা, মাতা, সখা বা প্রভু হিসেবে ভাবার মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই। এর বাইরে গেলেই বিপদের সম্ভাবনা। তাই পাছে না পিছলে পড়ি, ভগবানকে বাপ বা মা হিসেবে দেখাই ভাল। আমাদের যার যেখানে অবস্থান, সেখান থেকেই শুরু করা ভাল। একেবারে সব থেকে উঁচু থেকে লাফ মারা মোটেই সমীচীন নয়। যদি অন্তরে আমরা তেমন শুচিশুভ্র না হই যাতে ঈশ্বরকে আমাদের প্রেমাস্পদ হিসেবে চিন্তার মধ্যে মনে কোন আবিলতার উদ্রেক হয় না, যদি না আমাদের মধ্যে থাকে সেই অপ্রতিহত শুদ্ধতা, তবে আমরা সেই ধরনের ভগবৎপ্রেমের তাৎপর্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করে উঠতে পারব না আর সেজন্যই স্বামীজী আমাদের ঐ পথে যেতে নিষেধ করেছেন।

এছাড়া আরও নানাভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো যায়। এর একটি, যেমন ঠাকুর বলেছেন দাসভাব। এ খুব সহজ সম্বন্ধ—তুমি প্রভু, আমি তোমার ভৃত্য। এর উপরের ভাব সখ্য। ভক্ত তখন ঈশ্বরকে তার সমান বলে মনে করে, কারণ বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানেই। এর থেকে উন্নততর ভাব—সন্তান ভাব। শিশু যেমন তার পিতা মাতার কাছে আশ্রয় ও নিরাপত্তা চায়—সেই ভাব। প্রত্যেকেরই নিজের মনের গতি অনুসারে বিভিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে দেখে থাকে। তবে সব থেকে কঠিন আবার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাব—মধুর ভাব। এ এমন সম্বন্ধ যে দুজনের মনকে এক সুরে বেঁধে দেয়, দুজনে মিলে এক হয়ে যায়। ভক্তের আলাদা সত্তা থাকে না বলেই এই ভাবকে সর্বোত্তম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আগে যে সমস্ত ভাবের কথা বলা হয়েছে তার যে কোন একটি সাধনও যদি নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পূর্ণ করা যায়, তাহলে তার দ্বারাও ঈশ্বরোপলব্ধি হবে। দাস্য বা সখ্য ভাবে, সন্তান বা বাৎসল্য ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করলেও তাঁকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব এবং সাধন পথে কারোরই নিজস্ব ভাব ত্যাগ করা উচিত নয়। শাস্ত্রে কোথাও এ ভাব বা নির্দেশ নেই যে সাধক একটি ভাবের সাধন শেষে আবার একটি ভাবের আশ্রয় করবে। দাস্য-সখ্য ইত্যাদি ভাব একটির থেকে আর একটি বড় এই রকম স্তরভেদের বিষয় নয়। যার কাছে যে ভাবটি ভাল লাগে সে সেইটি নিয়ে ঐকান্তিক ব্যাকুলতার সঙ্গে অগ্রসর হলেই সে দিব্য প্রেমের পরিপূর্ণ আস্বাদন লাভ করবে। অপরের অনুকরণ না করে যে ভাব, যে সম্বন্ধ তার কাছে সহজ, সুন্দর ও রুচিকর মনে হয়, যাতে সে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে অগ্রসর হতে পারে, সেই প্রয়াসই সাধকের কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের প্রত্যেকেরই সংস্কারগত নিজস্ব কিছু প্রবণতা আছে। তাই এই বিভিন্ন ভাব থেকে

একটিকে যে আমরা বেছে নিতে পারি না তা নয়। এভাব আমাদের মজ্জায় মিশে আছে। প্রয়োজন শুধু সেইটি চিনে নিয়ে সেই ভাবানুযায়ী সাধন করা এবং যে কোন একটির ঐকান্তিক সাধনই আমাদের উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট।

সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥ ২৫ ॥

অন্বয় ঃ সা (সেই ভক্তি) তু (কিন্তু) কর্ম-জ্ঞান-যোগেভ্যঃ অপি (কর্ম, জ্ঞান বা যোগের পথ থেকেও) অধিকতরা (শ্রেষ্ঠ)।

অর্থ ঃ কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ, যোগমার্গের চেয়েও ভক্তির পথ শ্রেষ্ঠ।

ফলরূপত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় ঃ ফলরূপত্বাৎ (এই ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা এইজন্য)।

অর্থ ঃ ভক্তি স্বয়ং ফলরূপা বলেই অন্য মার্গ থেকে তার শ্রেষ্ঠত্ব।

ব্যাখ্যা ঃ দেবর্ষি রচিত ২৪টি সূত্রে তিনটি প্রধান বিষয় এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম। প্রথম হচ্ছে, পরাভক্তির সংজ্ঞা। প্রথম ছয়টি সূত্রে এই সংজ্ঞার তাৎপর্য বলা হয়েছে। পরবর্তী আটটি সূত্রে ভক্তি লাভের জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এবং শেষের দশটি সূত্রে পরাভক্তি সম্বন্ধে অন্যান্য আচার্যদের অভিমত ও পরাভক্তির তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে এখন ঈশ্বর লাভের জন্য

অন্যান্য যে সব পন্থা আছে তার সঙ্গে ভক্তির তুলনা করে আলোচনার চতুর্থ পর্যায় শুরু হচ্ছে।

বলছেন, কর্মমার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং যোগমার্গ থেকে ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ। কেন? 'ফলরূপত্বাৎ'। অতি সংক্ষিপ্ত পরবর্তী সূত্রে তার কারণ নির্দেশ করেছেন। ভক্তি কেবলমাত্র উপায় নয় উপেয়ও। ভক্তি একই সঙ্গে সাধন ও সিদ্ধি। প্রবর্তকরূপে ভক্তি অনুশীলন হচ্ছে সাধনপন্থা, এটি তখন উপায়। কিন্তু পথের শেষে আমরা যে লক্ষ্যে উপনীত হই সে-ও ভক্তি। তখন তা সাধ্য বা উপেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, বৈধী ভক্তি ও রাগভক্তি। শাস্ত্র বা মহাজনেরা যেসব বিধি নিষেধের নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথ অনুসরণ করার নাম বৈধী ভক্তি। আর সাধ্য হচ্ছে প্রেমাভক্তি বা পরাপ্রেমরূপা। অর্থাৎ শুরুতে যা থাকে আচরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, সাধন শেষে তাই হয়ে ওঠে চরম উপলব্ধি। এইজন্যই ভক্তি একসঙ্গে সাধন ও সাধ্যরূপা।

এখন প্রশ্ন, তাহলে ভক্তিকে সাক্ষাৎ ফল না বলে 'ফলরূপা' কেন বলছেন? একথা বলার কারণ, যে কোন কর্মের ফল হচ্ছে উৎপন্ন বস্তু। কিন্তু ভক্তি উৎপন্ন বস্তু নয়, ভক্তি আমাদের অস্তিত্বের, আমাদের সত্তারই উপাদান। কর্ম বা সাধন দ্বারা আমরা যে বস্তু লাভ করি তা আবার বিনষ্ট হতে বাধ্য। প্রাকৃতিক নিয়মই হচ্ছে যা অনিত্য তাকেই হারাতে হয়। অর্থাৎ কোন এক সময়ে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যদি কেউ একবার ভক্তি লাভ করেন, সে ভক্তির আর ক্ষয় নেই। এইটি বোঝাবার জন্য ফলরূপা বলা হয়েছে। এ যেন কোন প্রাপ্তি বলে মনে হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন কর্ম বা সাধনের দ্বারা লব্ধ আর পাঁচটা কর্মফলের মতো এই ভক্তি বস্তুটি নয়—এই-ই তাৎপর্য। ভক্তি স্বয়ং সাধ্য এবং তা আমাদের হৃদয়ে নিত্য

বর্তমান। তাই কোন প্রয়াসের দ্বারা তাকে সাধিত করতে হয় না। সাধনার দ্বারা পথের বিঘ্নগুলি অপসারিত করে তাকে প্রকাশিত করে দিতে হয় মাত্র।

ঈশ্বর যেমন নিত্যবস্তু ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাও তেমনই নিত্য। কিন্তু এটি আমাদের বোধে নেই বলেই আমরা এই সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। তপস্যা বা সাধন ভজনের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে তখন ভক্তির আবরক যে অসম্পূর্ণতা ও অপবিত্রতা আমাদের আছে তা দূর হয়ে যায় ও ভক্তির প্রকাশ ঘটে। সাধনভজনের ফলে যদি ঈশ্বরপ্রীতির উদ্ভব হতো, তবে অনিবার্য নিয়মেই যে কোন সময় তার বিলুপ্তিও ঘটত। সেইজন্যই ভক্তি যে এক বিশেষ কর্মের দ্বারা বিশেষ ক্ষণে উৎপাদ্য ভাব বা বস্তু, এ কথা বলা যায় না। ভক্তি বা তাঁর প্রতি ভালবাসা আমাদের অন্তরেরই বস্তু, কিন্তু আমরা অন্য দশটা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকি তাই এ ভালবাসাটা সুপ্তই থেকে যায়। এইজন্য ভক্তিকে ফল না বলে ফলস্বরূপ বলা হচ্ছে। সাধন দ্বারা লব্ধ বলে প্রতীত হলেও তা নয়, এটি নিত্য সিদ্ধ কেবল মাত্র মূর্ত হবার অপেক্ষা।

কর্ম, জ্ঞান বা যোগের সাধনার দ্বারা কিন্তু অন্যান্য কর্মের মতো বিশেষ ফল উৎপন্ন হয়, ভক্তিবাদীর এই অভিমত। কিন্তু জ্ঞান মার্গের আলোচনায় দেখা যায় যে জ্ঞানও কোন কর্মফল হতে পারে না। যে সত্যোপলব্ধির জন্য জ্ঞানীর সাধনা, সে সত্য এই বিচারপথ যথাযথ অনুসরণ করারই পরিণামে স্বয়ং প্রকাশিত হন। স্ব-স্বরূপের উপলব্ধি হচ্ছে জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য। তপশ্চর্যা ও বিচারের মাধ্যমে অজ্ঞানের আবরণ বিদূরিত হলে জ্ঞান আপনিই (স্বতই) উদ্ভাসিত হয় ও আমরা আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। সুতরাং জ্ঞান কোন উৎপন্ন বস্তু নয় বা বিশেষ

স্থানে বা বিশেষ ক্ষণে যে তার আবির্ভাব ঘটছে তাও নয়। সাধনার দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রকাশ হচ্ছে সে জ্ঞান আমার মধ্যেই ছিল। কিন্তু কতকগুলি বাধা সেই জ্ঞানকে আবৃত করে রেখেছিল। বিবেকবিচার রূপ সাধনায় সেই অজ্ঞান আবরণ অপসৃত হলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সুতরাং জ্ঞানও নিজেই সাধন ও সাধ্য উভয়ই। অন্যভাবে বলা যায় জ্ঞান কখনও কোন কর্মের ফল বা পরিণাম হতে পারে না। আমাদের আত্মস্বরূপের উদ্ভাসই জ্ঞান। আত্মজ্ঞান নিত্যবস্তু, অতএব সেই জ্ঞানের আলোকভূমিতে একবার উপনীত হলে আর সেখান থেকে বিচ্যুতি সম্ভব নয়। এই আত্মজ্ঞানই চরম উপলব্ধি। এ কোন বিষয়ের জ্ঞান নয়। এ নিজেই প্রজ্ঞানস্বরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে, ভক্তিমার্গের মধ্যে দিয়েও এই জ্ঞান লাভ করা যায়।

সূত্রে বলা হয়েছে কর্মযোগ থেকে ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্মযোগের ফলে চিত্ত সকল কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। কর্ম নিজে শুদ্ধও নয়, অশুদ্ধও নয়। কর্ম একটা সাধন পন্থা মাত্র। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা ধীরে ধীরে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং আমরা ক্রমশ উপলব্ধি করতে পারি যে, জ্ঞানমার্গে যে পরাভূমির কথা বলা হয়েছে সেই অবস্থা লাভ করাই মোক্ষ—আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য। আর সেজন্য সমস্ত অসম্পূর্ণতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে শুদ্ধ চিত্ত হতে হবে। যে সমস্ত পাশে আমরা বদ্ধ সেসব দূর করতে পারলে আমরা মুক্ত হব। অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি হচ্ছে ফল ও নিষ্কাম কর্মযোগের অভ্যাস সাধন। কর্মযোগ সাধন, কিন্তু সাধ্য নয়। কর্মযোগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, উভয়ের মধ্যে এই কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। ভক্তি ও জ্ঞানের মতো কর্ম স্বয়ং সাধ্য বস্তু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকবারই তাই বলেছেন—"কর্মযোগ বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন।...

কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তিযোগই যুগধর্ম।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯৩) "কলিতে অন্নগত প্রাণ—কলিতে নারদীয় ভক্তি।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১৩১)

এরপর যোগমার্গের প্রসঙ্গ। যোগের মূল কথা ইন্দ্রিয়াদির সংযম ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ। কিন্তু এগুলিও লক্ষ্যবস্তু নয়, লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্তির উপায় মাত্র। যোগানুশাসনের দ্বারা আমরা কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারি কিন্তু সে সাধনার দ্বারা যথার্থ বাঞ্ছিত ফল আমরা প্রাপ্ত হব, লক্ষ্যবস্তুকে প্রাপ্ত হব, তখন আর এই যোগমার্গের অনুষ্ঠানগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে না। যোগের পথ উপায় মাত্র, উপেয় নয়। সেইজন্যই ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কারণ ভক্তি সাধনের প্রারম্ভ থেকে প্রাপ্তি পর্যন্ত সাধককে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। ভক্তির পথকে তাই কর্ম, জ্ঞান ও যোগের থেকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে।

তবে ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে জ্ঞান সাধনমাত্র, কিন্তু সাধ্য নয়। জ্ঞান লাভের প্রয়াস ও জ্ঞান লাভ এই দুয়ের মধ্যে তাঁরা একটা পার্থক্য করছেন। জ্ঞানমার্গী সাধকের দৃষ্টিতে কিন্তু জ্ঞান ও জ্ঞেয়র মধ্যে চরম কোন পার্থক্য নেই। পরাভূমিতে জ্ঞান ও জ্ঞেয় এক। আমরা অবশ্য বিষয়টিকে জ্ঞানমার্গীর দৃষ্টি থেকে আলোচনা করব না বা ভক্তিমার্গীদের মতের সঙ্গে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্যকে কোন গুরুত্ব দেব না, আমরা এখানে আলোচনা করে শুধুমাত্র ভক্তের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়টি দেখব। তাঁর কথা হচ্ছে জ্ঞানের পথ হলো বিচারের পথ আর এইখানেই এর সীমাবদ্ধতা। নিত্যানিত্য বস্তুর বিচার হচ্ছে সাধন। আর তারই সাহায্যে অনিত্য বস্তু ত্যাগ করে সাধক নিত্যবস্তু লাভ করেন। এরই নাম মোক্ষ। বিবেকজ্ঞানের ফলে যে সত্যে আমরা উপনীত হই তা অবশ্যই

বিবেক-বিচার রূপ সাধন থেকে স্বতন্ত্র অবস্থা। ভক্তিবাদী এইজন্যই এর থেকে ভক্তি পথকে শ্রেয় বলেছেন কারণ ভক্তিরাজ্যে প্রথম থেকেই ভক্তির সাধন ও অন্তে সেই ভক্তিই লাভ। 'ভক্তি' শব্দটির মধ্যে সাধন-সাধ্য দুটি ভাবই আছে। হতে পারে সাধনার প্রথম দিকে ভক্তির রূপ তত উজ্জ্বল নয়, নয় তা নিঃস্বার্থ বা শুদ্ধ। কিন্তু সাধন পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় এই ত্রুটিগুলি ক্রমশ দূর হতে থাকে, উত্তরোত্তর ভক্তির তীব্রতা ও মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ভক্তি শুদ্ধ ও গভীর হতে থাকে। ভক্তির চরম অবস্থাই ভক্তের পরম সাধ্যবস্তু। একই ভক্তি স্তরভেদে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই একটু অন্যভাবে বলেছেন। তিনি বলেছেন—"পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। 'নেতি' 'নেতি' করে বিচারের শেষ হলে ব্রহ্মজ্ঞান।—তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে উঠবার সময় সাবধানে উঠতে হয়। তারপর দেখে যে ছাদও যে জিনিসে—ইট-চুন-সুরকি—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারি!" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৮৭০) ভক্তের কিছু ত্যাগ করতে হয় না। তিনি সবটাই নেন, জগৎকে অস্বীকার করেন না। সেক্ষেত্রে জ্ঞানী কিন্তু জগৎকে মায়াময় বলেন।

ভক্ত জগৎকে ত্যাগ না করে তাকে ঈশ্বরের বিভূতি ও তাঁর লীলারূপে দেখেন। আর জ্ঞানীর ক্ষেত্রে জগদাতীত সত্তাকে উপলব্ধি করার জন্য প্রথম থেকেই জগৎটাকে 'নেদম্' বা 'এই নয়' বলে অস্বীকার করা। ভক্ত বলেন, জগৎকে অস্বীকার করলে সত্যের উপলব্ধি আংশিক দর্শন মাত্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় খোসা-বিচি-শাঁস সব নিয়েই একটা বেলের ওজন। এখন এগুলো যদি বাদ দিই পুরো বেলটা আমরা পাচ্ছি

না। খোসা, বিচি বাদ দিয়ে শুধু শাঁসটুকু নিলে তাকে পাই খণ্ডিত ভাবে। এই হচ্ছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর মত।

শ্রীরামকৃষ্ণও এই একই কথা বলেছেন—"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, আর শাঁস আলাদা একজন করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায়? খোলা, বিচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বিচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার করে দেখে—যে বস্তুর শাঁস সেই বস্তুরই খোলা আর বিচি। আগে নেতি নেতি করে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি, এইরূপ বিচার করতে হয়; ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়, যাঁর শাঁস তারই খোলা, বিচি। যা থেকে ব্রহ্ম বলছ তাই থেকে জীবজগৎ। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৭৭৮-৭৯)

এখন দুটি মতের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? সাধনার গোড়ায় বিচার সাহায্যে অনিত্য বস্তু ত্যাগের পথ অবলম্বন করে পরম সত্য উপলব্ধি করার পর জ্ঞানী কি বলছেন? তখনও তিনি বলছেন, পরম তত্ত্বই একমাত্র নিত্য সত্য সদ্বস্তু। পরিদৃশ্যমান জগৎ অনিত্য অসত্য। সুতরাং অনিত্য বস্তু ত্যাগের দ্বারাই পরা প্রাপ্তি সম্ভব।

আর ভক্ত বলেন, তাঁর কিছুই ত্যাগ করার নেই, কারণ তিনি দেখেন অন্যভাবে। তিনি যা কিছু দেখেন সবই তাঁর কাছে ঈশ্বর। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তিনি আমাকে তথা বিশ্বজগৎকে ব্যাপ্ত করে আছেন। তিনি ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই নেই। আর জ্ঞানী বলছেন যে জগতের কোন পৃথক অস্তিত্বই নেই। যাকে জগৎ বলছ তা ব্রহ্মই। একমাত্র এক সৎ বস্তু আছেন ভ্রমবশত তাকেই দেখি বিচিত্ররূপে। আপাতদৃষ্টিতে মনে

হয় দুজনের বক্তব্য যেন একই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে গভীর পার্থক্য আছে। ভক্ত বলেন, যা দেখছ সবই ব্রহ্ম। আর জ্ঞানী বলেন, যা দেখছ তার সত্য অস্তিত্বই নেই। একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য ও সৎ বস্তু। এই প্রসঙ্গে মেরি হেল নামে এক ভক্ত মহিলার লেখা চিঠির উত্তরে স্বামীজীর বক্তব্যটি উল্লেখ করা যায়। মেরি লিখেছিলেন, আপনাদের বেদান্তের মত তাহলে এই যে সবই ব্রহ্ম। স্বামীজী উত্তর দিলেন, তুমি সম্পূর্ণ ভুল বুঝেছ। বেদান্ত বলেন, ব্রহ্ম একমাত্র আছেন, অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। বেদান্ত সম্বন্ধে এই প্রাথমিক ভুলটি প্রায়শই দেখা যায়। ঈশ্বর সর্ববস্তুতে আছেন, একথা বেদান্ত বলে না। অন্য কোন বস্তু নেই-ই এই হলো বেদান্তের অভিমত। এখানে বেদান্তের সুপরিচিত উদাহরণ সর্প-রজ্জু। আধা আলো, আধা অন্ধকারে আমরা একটি সাপ দেখতে পেলাম। কিন্তু ভালভাবে দেখার জন্য আলো আনলে দেখা গেল ওটি সাপ নয় দড়ি। অর্থাৎ দড়িটারই সত্যকার অস্তিত্ব আছে। সাপের কোন অস্তিত্বই নেই। যাকে সাপ ভাবছিলাম সেটি দড়ি মাত্র। সবই ব্রহ্ম অর্থ সেইরকম। জগৎ বলে যা দেখছি তার প্রকৃত কোন অস্তিত্বই নেই। তা ব্রহ্মে আরোপিত। অর্থাৎ ব্রহ্মই আছেন, জগৎ নেই। এই হচ্ছে জ্ঞানীর চিন্তাধারা। ভক্তের কাছে কিন্তু 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ ভগবানই সব হয়েছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কিছু নেই। যা দেখছি সবই সত্য কিন্তু সে সত্যতা তাঁরই সত্তায়। তাঁরই অস্তিত্বে জগৎ অস্তিত্ববান।

একই ভাবে একই মহাবাক্য 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-র অর্থ প্রকাশভঙ্গির পার্থক্যর জন্য দুরকম হচ্ছে। এটি একটি উদাহরণ, অন্যান্য উপনিষদের বাণীও এইরকম ভক্ত ও জ্ঞানীভেদে দুজন মতবাদীর কাছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়। এইটি মনে রাখা দরকার।

ভক্তের দৃষ্টিতে, তাঁর ভক্তি সাধনার শুরু থেকে সিদ্ধি পর্যন্ত একই প্রকৃতির। এই জন্যই অন্যান্য পথ থেকে ভক্তির পথকে শ্রেয়তর বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দুটি পথের পার্থক্য এই ভাবে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে জ্ঞানমার্গের পথিককে কিছু কিছু ত্যাগ করতে হয় আর ভক্ত সবটাই গ্রহণ করেন। জ্ঞানীকে যে কোন ভোগ্য বস্তুই ত্যাগ করতে হয় আর ভক্ত সবটাই গ্রহণ করেন। কোন ভোগ্য বস্তুই ত্যাগ করতে হয় না, যদি ভোগের ধারাটি শোধিত করে নেওয়া হয়। তখন সমস্ত কিছুরই এক অপূর্ব মহনীয়তায় উত্তরণ ঘটে। প্রথমদিকে জগৎটাকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন তদ্ব্যতিরিক্ত কিছু মনে হতে পারে, কিন্তু সাধনার শেষে ভক্ত দেখেন যে যা কিছু জাগতিক বিষয় সে সমস্তই শাশ্বতভাবে তাঁরই সঙ্গে যুক্ত। তিনিই সর্বভূতে বিরাজিত।

যোগমার্গের থেকেও ভক্তি শ্রেয়, একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তবে এটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যোগের যে চিত্তশুদ্ধির সহায়ক মূল সাধন—যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়ামাদি বা চিত্তবৃত্তির নিরোধ, তা জ্ঞান বা ভক্তি সকল ক্ষেত্রেই আবশ্যক। সেইজন্য বহুক্ষেত্রে যোগমার্গের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করাও হয় না। সাধনমার্গের যে কোন ক্ষেত্রেই যোগ-এর অনুশাসন সাধকের প্রভূত সাহায্য করে।

একমাত্র গীতাতেই কর্ম অর্থে যোগ শব্দটি ব্যবহৃত। গীতাকার জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম তিনটি যোগের উল্লেখ করেছেন। কর্মযোগ হচ্ছে নিষ্কামভাবে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন। গীতায় পৃথকভাবে কোন যোগমার্গের কথা বলা হয়নি। চিত্তসংযম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহারের যে উল্লেখ আছে তা অপর তিনটি মার্গের আনুষঙ্গিকরূপেই বলেছেন। তিনি যোগ বলতে কর্মফল ত্যাগ করে নিঃস্বার্থ কর্মপথের কথাই বলেছেন। আমরা যেভাবে

যোগ শব্দটির অর্থ বুঝি তিনি সেই অর্থে গীতায় যোগ শব্দটি ব্যবহার করেননি। কিছু কিছু আসন, মুদ্রা বা প্রাণায়াম অভ্যাস করলেই আমরা মনে করি তিনি যোগী। এইভাবে শরীর হয়তো সাধনোপযোগী হতে পারে বা যদি কেউ মনঃসংযমাদি অভ্যাস করেন তবে তাঁর মানসিক উন্নতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু এটি কোনক্রমেই যোগমার্গ নয়। [সুতরাং ভগবান গীতায় যে 'যোগী ভব' 'যোগী হও' বলেছেন, তার নিশ্চয়ই অন্য অর্থ থাকবে]। তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়ে তাঁর প্রীতির উদ্দেশ্যে নিষ্কাম কর্মের অর্থই কর্মযোগ এবং সেই কর্মই কালে ভক্তির একটি অঙ্গ হতে পারে।

ঈশ্বরস্যাপি অভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈন্যপ্রিয়ত্বাৎ চ ॥ ২৭ ॥

অন্বয় ঃ ঈশ্বরস্য অপি (ঈশ্বরেরও) অভিমান (অহঙ্কারের প্রতি) দ্বেষিত্বাৎ (বিদ্বেষ হেতু) চ (এবং) দৈন্য (দীনতার প্রতি) প্রিয়ত্বাৎ (প্রিয়ত্ব হেতু) [ভক্তি শ্রেষ্ঠ]।

অর্থ ঃ ঈশ্বর স্বয়ং অহঙ্কারী ব্যক্তির প্রতি বিরূপ ও দীনব্যক্তির প্রতি প্রীতিযুক্ত বলেই ভক্তিপথ অন্যান্য পথের তুলনায় শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ ইতঃপূর্বে ২৫ নম্বর সূত্রে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের কারণ বলা হয়েছে যে ভক্তি একাধারে উপায় ও উপেয়—ভক্তির দ্বারা ভক্তি লাভ হয় এবং ভক্তের মতে অন্য কোন পথে তা হয় না বলেই ভক্তি শ্রেয়তর।

বর্তমান সূত্রে সেই শ্রেষ্ঠত্বের অপর হেতু বলছেন যে ভক্তির মধ্যে অহঙ্কার অভিমানের সম্ভাবনা নেই। অপরদিকে বরং ভক্তি দীনতার প্রতিমূর্তি। অহঙ্কারের প্রতি আছে ঈশ্বরের বিদ্বেষ আর দীনতা ও নম্রতার

প্রতি তাঁর অনুরাগ। আর সেইজন্যই তিনি ভক্তিপ্রিয়, কারণ ভক্তিতে অহঙ্কার নেই, আছে দৈন্য। অন্যান্য পথের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদীর এইটি বড় অভিযোগ যে কর্মক্ষেত্রের সাফল্য কর্মযোগীকে অহঙ্কারী করে তুলতে পারে। আর জ্ঞানী নিজেকে যখন 'অহং ব্রহ্ম' বলেন তখন আর তাঁর মধ্যে দীনভাব থাকতে পারে না, নিজেকে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবতে পারেন।

সাধারণত সৎ কর্মের অনুষ্ঠান যাগযজ্ঞ, পূজা প্রভৃতি যাঁরা করেন অনেক সময়ই তাঁদের মধ্যে আমি বেশ ধর্মপরায়ণ—এই রকম একটা অভিমান এসে পড়ে। অপরের সঙ্গে তুলনা করে এই অহঙ্কারে তিনি আরও বেশি স্ফীত হন। জ্ঞানীর ক্ষেত্রে এই ভ্রান্তির সম্ভাবনা তার চেয়ে বেশি। এমনকি স্বামীজীর মতো ব্যক্তিও যখন জ্ঞানমার্গের কথা বলতেন, সাধারণ লোকে এটি তাঁর অহমিকা বলেই ভাবত। যদি কেউ সদর্পে বলে 'আমিই ব্রহ্ম' তবে অন্যের পক্ষে আশঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক। ভক্তিবাদী তাই বলতে চান অন্য দুটিতে অহঙ্কার প্রবেশের সম্ভাবনা প্রবল, কিন্তু ভক্তের সে ভয় নেই। নিরহঙ্কার ভাব ও তৃণাদপি দীনভাব ভক্তির পরিচায়ক। অতএব ভগবানের কাছে ভক্ত অবশ্যই অধিকতর প্রিয় হবেন। তাঁর অহমিকা থাকতেই নেই—এটাই ভক্তের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভক্তিপথের বড় বড় মহাজনেরা প্রত্যেকেই এই দুটি বিষয়ের উপরই অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন—একটি অভিমান বর্জন, অপরটি দৈন্যভাব। ভক্তিমার্গের অন্যতম উদ্গাতা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাই এই শ্লোকটি প্রায়ই তাঁর অনুগামীদের বলতেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

(শ্রীচৈতন্যকৃত শিক্ষাষ্টকম্, শ্লোক-৩, স্তবকুসুমাঞ্জলি)

তৃণকে সবাই পদদলিত করে চলে যায়—সে প্রতিবাদ করে না, সেই তৃণ অপেক্ষাও যিনি বিনম্র, বৃক্ষ থেকেও যিনি সহিষ্ণু, যিনি স্বয়ং নিরভিমান, অপরের কাছ থেকে কোন সম্মান বা শ্রদ্ধার প্রত্যাশী নন, অথচ অপর সকলকেই সম্মান প্রদর্শন করেন—তিনিই ভগবানের মহিমা কীর্তনের অধিকারি। সুতরাং ভক্ত যিনি হতে চান এই গুণগুলি তাঁকে অবশ্যই অর্জন করতে হবে। কর্মী বা জ্ঞানীর সঙ্গে তুলনায় ভক্তের মানসিকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

তাই নারদ বলছেন, ঈশ্বরের আনুকূল্য লাভ করতে হলে নিরভিমানতা ও নম্রতা অতি আবশ্যক। স্বামীজীকে অবশ্য আমরা অনেক সময়েই এই বৈষ্ণববিনয় সম্বন্ধে বিদ্রূপ করতে শুনি। তিনি পরিহাস করে বলতেন, 'বুঝেছি, তুই বুঝি বৈষ্ণব, তাই তোর এমন দীনের থেকেও দীন ব্যবহার।' তবে তাঁর এ-কথা বলার কারণ ছিল যে, এ বিনয় নিছকই লোক দেখানো—এর মধ্যে আন্তরিকতার ছিটে-ফোঁটাও নেই। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করতেন যে এ ধরনের 'আমি নগণ্য', 'আমি দীনাতিদীন' বলে লোকে যে বিনয় প্রকাশ করে, তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অভিনয় মাত্র। দীনতা ভাল, যদি তা আন্তরিক হয়। কেবলমাত্র মুখে 'আমি অধম' বলা নয়। যদি মুখে বলি আমি দীনের দীন, অথচ অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি তাহলে তা দীনতার ভান মাত্র। প্রকৃত ভক্ত নিজেকে দীনাতিদীন মনে করবেন ও কোন ব্যক্তির উপরই কর্তৃত্ব দেখাবেন না। তাঁকে হতে হবে বৃক্ষের থেকেও সহিষ্ণু। গাছ মানুষকে ক্ষুধায় ফল দেয়, ক্লান্তির সময় ছায়ায় আশ্রয় দেয়। প্রতিদানে মানুষ কি করে? গাছের ডাল কেটে নেয়। তবু কিন্তু গাছ সহ্য করে, ক্ষমা করে, প্রতিশোধ নেয় না। অবশ্য এ একটা দৃষ্টান্ত, দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজলে চলবে না। কারণ গাছ

জ্ঞাতসারে ক্ষমাও করে না, প্রতিবাদের সামর্থ্যও তার নেই। এটাই বুঝবার যে কেউ অনিষ্ট সাধন করলেও প্রকৃত ভক্ত তার মঙ্গল করবেন, বিদ্বেষের পরিবর্তে বিদ্বেষ পোষণ করবেন না বা প্রতিশোধ নেবেন না। লোকে যত অসৎ ব্যবহারই করুক না কেন তিনি কোন অপরাধ গ্রহণ করবেন না, শান্ত ভাবে সহ্য করবেন। ভক্তের এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমাশীলতাই তাঁকে ভগবানের প্রিয় করে। এই ভক্ত অপরের কাছে মান চান না, কিন্তু অপরকে সর্বদাই সম্মান দিয়ে থাকেন। এই সব গুণ যাঁর আছে তিনিই প্রকৃত ভক্ত ও তাঁরই ভজন আন্তরিক এবং ফলপ্রসূ হয়।

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥ ২৮ ॥

অন্বয় ঃ জ্ঞানম্ এব (জ্ঞানই) তস্যাঃ (সেই ভক্তির) সাধনম্ (উৎপত্তির কারণ) ইতি (এই কথা) একে (কেউ কেউ বলেন)।

অর্থ ঃ কোন কোন ব্যক্তির মতে একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই ভক্তির উদয় হতে পারে।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূত্রে জ্ঞানের দ্বারাই ভক্তিলাভ হয় কোন কোন আচার্যের এই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। কিসের জ্ঞান? জ্ঞানও সাধন এবং সাধ্য দুই-ই। ভক্তি হচ্ছে ভাবের বিষয়। কিন্তু এই ভাবটি যাতে সম্যকভাবে ঈশ্বরাভিমুখী হয়, সেজন্য জ্ঞান ও বিচার প্রয়োজন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ তরুণ নরেন্দ্রনাথকে একবার এ বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মজীবনে শুদ্ধাভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে ঠাকুরের কাছে গিয়েছেন। তখন তিনি উত্তর দিচ্ছেন যে, ঈশ্বরকে না জানলে ভক্তি করবে কাকে? কে হবেন সেই ভক্তির আধেয়? ভক্তিলাভ করতে আগে জ্ঞানের প্রয়োজন।

যাকে ভক্তি করবে তাঁর সম্বন্ধে কিছু তো জানা চাই। না হলে ভক্তিভাব আসবে কেন? তাই ভগবানের প্রতি ভক্তির ক্ষেত্রেও ঈশ্বর কে, তিনি কেমন এ সম্বন্ধে একটা সামান্য (সাধারণ) ধারণা না থাকলে তাঁর প্রতি অনুরাগ আসবে কেমন করে? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—যাঁকে জানিস না তাঁকে ভক্তি করবি কেমন করে? আবার সেই সঙ্গে এ কথাও যোগ করেছেন, "আর এক ধরনের ভক্তি আছে তাকে বলে জ্ঞান-ভক্তি। এ ভক্তি আসে বিচারের দ্বারা।"

সাধন ক্ষেত্রে যেটি বিশেষ আবশ্যক, সেটি হচ্ছে লক্ষ্যে উপনীত হবে কোন্ পথে এবং সে পথের পাথেয় কি তা সুস্পষ্টভাবে জানা। লক্ষ্য ও উপায় দুটি বিষয়েই সামান্য জ্ঞান পূর্বাহ্নেই থাকা দরকার। তা না হলে পথ চলব কেমন করে? পথের দিশা না জানলে পথ চলা সম্ভব নয়। আবার লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধেও অবহিত না হলে এগিয়ে যাওয়া যায় না। সেই জন্যই কোন কোন আচার্যের মতে জ্ঞান ভক্তির প্রাক্-প্রস্তুতি।

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যন্যে ॥ ২৯ ॥

অন্বয় ঃ অন্যোন্য (পরস্পরের প্রতি) আশ্রয়ত্বম্ (নির্ভরশীলতা) ইতি (এই কথা) অন্যে (অন্য আচার্যগণ) [বলে থাকেন]।

অর্থ ঃ অপর কোন কোন আচার্যের মতে জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল।

ব্যাখ্যা ঃ এই যে কোন কোন আচার্যের মতে বলছেন, এতে বোঝা যায় এটি নারদের নিজস্ব অভিমত নয়। ভক্তিলাভের জন্য অন্যান্য আচার্যদের নির্দেশিত পন্থারই তিনি উল্লেখ করেছেন। যাই হোক এই সূত্রে

বলা হয়েছে ভক্তিলাভের জন্য জ্ঞান ও ভক্তি দুটোরই প্রয়োজন এবং এ দুটি পরস্পর সাপেক্ষ। ভক্তির পাত্রকে জানার জন্য যেমন জ্ঞানের প্রয়োজন তেমনি সেই জ্ঞান উপযুক্ত খাতে প্রবাহিত করার জন্য প্রয়োজন ভক্তির [তা না হলে তা হবে শুষ্ক জ্ঞান মাত্র]। অতএব জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরের পরিপূরক এ মতটি সুসমঞ্জস বলা যায়।

স্বয়ং ফলরূপতা ইতি ব্রহ্মকুমারঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয় ঃ স্বয়ং (ভক্তি নিজেই) ফলরূপতা (সাধ্যরূপা) ইতি (এই কথা) ব্রহ্মকুমারঃ (ব্রহ্মার পুত্র) [বলেছেন]।

অর্থ ঃ (ব্রহ্মকুমার) নারদের মতে ভক্তি নিজেই নিজের ফলস্বরূপ।

ব্যাখ্যা ঃ ব্রহ্মার পুত্র নারদ বলেছেন যে, সাধনের পরিণাম অবস্থাই হচ্ছে ভক্তি। সুতরাং ভক্তি স্বয়ংই সাধ্য। অন্যভাবে বলা যায় ভক্তি কোন কিছুরই ফল নয়। সর্বনিরপেক্ষ এই ভক্তি জ্ঞান-কর্ম কিছুরই উপর নির্ভর করে না। ভক্তি স্বয়ংসিদ্ধা। পরাসিদ্ধির এই হচ্ছে স্বরূপ। ভক্তিই ভক্তির লক্ষ্য, তাই অন্য কিছুর অপেক্ষা তার থাকতে পারে না, এই হচ্ছে দেবর্ষির অভিমত। [ভক্তির মূর্ত বিগ্রহই হচ্ছেন ভক্ত] ভক্তের স্বরূপই ভক্তি—ভক্তি পথের যাবতীয় আচার অনুষ্ঠানের সম্যক পরিপালন ও সমন্বয়ই ভক্তির নির্যাস পরাভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, ঈশ্বরের প্রতি যে অসীম অনুরাগ সেটাকেই বলা হয় পরাভক্তি বা প্রেমাভক্তি। ভক্তিপথেই যেখানে ভক্তিলাভ সেখানে তখন জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। বৈধী ভক্তির দ্বারা রাগ ভক্তি, কাঁচা ভক্তির পাকা ভক্তিতে পরিণতি—এই হলো ভক্তিপথের

যাত্রা। এইভাবে বলতে পারি ভক্তিরই মাধ্যমে বা ভগবানের কৃপায় ভক্তি লাভ হয়।

রাজগৃহ-ভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

অন্বয় ঃ রাজগৃহ (রাজপ্রাসাদ) ভোজন (আহার) আদিষু (প্রভৃতির) [জ্ঞানে] তথা এব (সেইরূপই) দৃষ্টত্বাৎ (দেখা যায় এই হেতু)।

অর্থ ঃ রাজপ্রাসাদ দর্শন বা ভোজ্য দ্রব্যের জ্ঞান, এর দৃষ্টান্ত।

(ভক্তিসম্পর্কেও কেবল জ্ঞানমাত্রই ভক্তকে তৃপ্ত করতে পারে না)।

ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুধাশান্তির্বা ॥ ৩২॥

অন্বয় ঃ তেন (সেই জ্ঞানের দ্বারা) রাজপরিতোষঃ (রাজার সন্তুষ্টি) ক্ষুধা শান্তিঃ (ক্ষুধার নিবৃত্তি) ন (হয় না)।

অর্থ ঃ রাজপ্রাসাদের জ্ঞান কারও থাকতে পারে, কিন্তু তাতে রাজার সন্তোষ বিধান করা যায় না অথবা আহার্য বস্তুর জ্ঞান দ্বারা কারও ক্ষুন্নিবৃত্তি হতে পারে না।

তস্মাৎ সা এব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয় ঃ তস্মাৎ (সেইজন্য) সা এব (ভক্তিই একমাত্র) মুমুক্ষুভিঃ (মুক্তিকামী ব্যক্তিদের দ্বারা) গ্রাহ্যা (গ্রহণযোগ্য)।

অর্থ ঃ সেইজন্য যাঁরা মুক্তি চান, তাঁরা ভক্তিপথই অবলম্বন করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তিতে জ্ঞানের অপেক্ষা আছে, না তাতে অন্য কোন বিষয়ের সহায়তার প্রয়োজন নেই—এই প্রসঙ্গের আলোচনাক্রমে নারদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে ভক্তি স্বয়ংই ফলরূপা (৩০নং সূত্র)। ভক্তি স্বয়ংসিদ্ধ ও সর্বনিরপেক্ষ। দুটি সূত্রের দ্বারা তিনি এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। কোন ব্যক্তির যদি রাজার প্রাসাদ সম্বন্ধে পরিপাটি (ভালমতো) জ্ঞান থাকে (বা) রাজাকে সে চেনে মাত্র, তাতে রাজাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। সুতরাং এই জ্ঞানের কোন কার্যকারিতা এখানে নেই। তেমনি ঈশ্বরকে শুধু জানলেই হয় না, তাতে তিনি তৃপ্ত নন। ঈশ্বরকে জানা মানেই এ নয় যে তাঁকে ভালবাসা হলো। তাঁকে ভালবাসতে হলে সেই অনুরাগের ভাবটি মনে আনা চাই, পোষণ করা চাই। সেখানে জ্ঞান কোন কাজে আসে না। আরও একটি দৃষ্টান্ত নারদ দিয়েছেন, সেটি আহার সংক্রান্ত। নানাবিধ রসনাযুক্ত খাদ্যের বিষয় জানা থাকলেও সেই জ্ঞান ক্ষুধার্ত ব্যক্তির কোন উপকারে আসে না, তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। তার পরিতৃপ্তির জন্য খাদ্যেরই প্রয়োজন।

এইরকম ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানের দ্বারাও যে ভক্তির কোন বৃদ্ধি হয় না, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সে কথাই বলতে চেয়েছেন। ঈশ্বরকে প্রীতি করতে হলে তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ ধরনের প্রীতির বা প্রেমের সম্বন্ধ গড়ে তুলতে হয়। জ্ঞান যে ভক্তির সহায়ক নয় এ কথাই দেবর্ষি সুন্দরভাবে এখানে উপস্থাপিত করছেন। যদি ভক্তি বা ভালবাসাই না থাকল তবে শুধু জ্ঞান দিয়ে কি হবে? হৃদয়ে প্রেম থাকলে তবে তাকে ভগবদাভিমুখী করা যায়। আর প্রেম স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপার, জ্ঞানের দ্বারা তা সংঘটিত হতে পারে

না। জ্ঞান এখানে অপ্রধান। কাকে ভালবাসছি সেটা জানা এমন কিছু অত্যাবশ্যক নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের কথার সঙ্গে এর একটা আপাত বিরোধিতা আছে মনে হয়। কেননা তিনি বলছেন, ভালবাসার পাত্রকে যদি না-ই চিনি না-ই জানি তবে তাঁর প্রতি আমার ভালবাসা কেন আসবে, কেমন করেই বা আসবে? এর সমাধান হচ্ছে যে, জ্ঞানের দ্বারা ভালবাসার সঞ্চার হয় না বটে অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি উৎপন্ন না হলেও, তিনি কে এইটুকু জানা যে তাঁর দিকে আমাদের প্রেমকে আরও সঞ্চারিত হতে সাহায্য করে, একথা ঠিক।

ভক্তির জ্ঞাননিরপেক্ষতা বোঝাতে এর আগে রাজার উদাহরণ দেওয়া হয়েছিল। আমরা একজন রাজাকে চিনতে পারি, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? সে জ্ঞান আমাদের প্রতি তাঁর সন্তোষের অথবা তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন হার্দিক বন্ধনের কারণ হয় না। রাজার একজন শত্রুরও তাঁর সম্বন্ধে পুরো খবর জানা থাকতে পারে, সেই রকম ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কেউ হয়ত অনেক আলোচনা করেছেন ও ঈশ্বরকে জেনেছেন ভাবতে পারেন। কিন্তু তাতে তাঁর কিছুমাত্র ভক্তিলাভ হলো না। তা থেকে গেল শুধু এক বৌদ্ধিক ব্যাপার, মানসিক কসরত মাত্র, যাতে আসল লাভ রইল শূন্যের কোঠায়। এই বিষয়টি এখানে বারবার জোর দেওয়া হচ্ছে।

পূর্ববর্তী সূত্রে বলেছেন, 'অন্যোন্যাশ্রয়ত্ব' (সূত্র নং ২৯)। এই পরস্পরের উপর নির্ভরতা, এটা কিন্তু যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ অভিমত বলে আমাদের মনে হয়। কাকে ভক্তি করব তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান থাকলে তা স্বভাবতই আমাদের ভক্তিকে তাঁর দিকে অভিমুখী করবে। যদি

আমরা ঠিক ঠিকভাবে জানি যে ঈশ্বরই আমাদের পরমভক্তির একমাত্র আস্পদ, তাহলে ভক্তি তাঁর দিকে উৎসারিত হতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই।

কিন্তু দেবর্ষি ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর বক্তব্য, না-ই বা তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানলাম, তা বলে কি ভালবাসা আসতে পারে না? আর তাঁকে কে জানতে পারে যে জানবার পর অনুরক্ত হবে? ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ, কণার কণা। তা সত্ত্বেও তাঁকে ভক্তি করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ভক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানের প্রয়োজন যে নেই এ কথা গ্রন্থারম্ভে ভক্তির সংজ্ঞা নিরূপণেই (দ্বিতীয় সূত্র) দেবর্ষি ঘোষণা করেছেন। ভক্তি হচ্ছে 'তস্মিন্' বা এই বিষয়ের প্রতি পরমপ্রেম। ভালবাসার পাত্রটি কে তার কোন সুস্পষ্ট পরিচয় না দিয়ে বলছেন, এঁর প্রতি। কাকে ভালবাসছি তা না জেনেই তাঁকে মনপ্রাণ সমর্পণ করা—এরই নাম পরাভক্তি, যা করলে তবেই সেই চরম উপলব্ধি সম্ভব। [রাধা কৃষ্ণকে দেখেননি, নাম শুনেই ভালবাসলেন]।

দেবর্ষি ভক্তের জন্য জ্ঞানের অবদানকে এইভাবে অস্বীকার করলেও, সাধারণের জন্য এর প্রয়োজন কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। লক্ষ্য এবং তা প্রাপ্তির উপায় জানতেই হবে এমন কথা না বললেও যতটুকু সম্ভব ততটুকু গোড়ায় জানা থাকলে তা প্রায়ই সাধন পথে সহায়তা করে। এ বিষয়ে একটা উদাহরণ দেওয়া যায়। একজন লোককে বলা হলো তুমি চোখ দুটো বন্ধ করে এই গরুর ল্যাজটা যদি ধরে থাক, তবে এ তোমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবে। লোকটি তো স্বর্গ কি তা-ও জানে না, কিভাবে সেখানে যাওয়া যায় তা-ও জানে না। ফলে সে তাই করল আর গরুটা তাকে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ায় সে ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত শরীরে ভাবতে লাগল এই-ই বুঝি স্বর্গের পথ। এইটাই এখানে বলবার

যে, একেবারে কোন জ্ঞান না থাকলে তা হয় অন্ধের দশার মতো। স্বর্গে পৌঁছনো তো দূরের কথা তার দুর্দশার অন্ত থাকে না। কোথায় যেতে চাই, কোন পথে যাব, পথের সম্বল কি কিছুই যদি না জানি তবে তা হবে এক মস্ত বড় মাঠে চোখ বেঁধে ঘুরে বেড়াবার মতো—কোথাও কোনদিন আর পৌঁছনই হবে না।

তাই অন্ধ ভক্তি কোন কাজের নয়। জ্ঞানও প্রয়োজন, তবে আগেই বলেছি একথা সাধারণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ভক্তির জ্ঞানসাপেক্ষতা বিষয়ে নারদের আপত্তির একটা আলাদা অর্থ আছে যা শ্রীরামকৃষ্ণ কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন। লক্ষ্যবস্তু সম্বন্ধে যদি কেউ অজ্ঞ হয় তাতে ক্ষতি নেই, যদি তার মনে সত্যিকারের তীব্র অনুরাগ থাকে। ঈশ্বর জানেন সে কি চাইছে। তার ঈশ্বরের মহিমাও জানা নেই কেমন করে তাঁকে ডাকতে হয় তাও সে জানে না—কিন্তু তার একনিষ্ঠ ভক্তি তাকে লক্ষ্যে উপনীত করে দেয়ই।

কিন্তু মন্দ অনুরাগী বা সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই জ্ঞান সহায়ক হয়। এ জ্ঞান যদিও অসম্পূর্ণ বা অ-শুদ্ধ তবু তা তার উদ্দীপনার হেতু হয়। অপর দিকে আন্তরিকভাবে ব্যাকুল যে ভক্ত তাঁর ঈশ্বর কে, কেমন—এ সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকলেও তাঁর ব্যাকুলতাই তাঁকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটা অন্ধের পথ চলা নয়। ঈশ্বর সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ। তিনি যখন দেখেন যে ভক্ত তাকে না জেনেও তাঁকেই চাইছে অথচ কোন্ পথে পাবে তা জানে না, তখন তিনিই তাঁকে পথ দেখান। সুতরাং জ্ঞান অত্যাবশ্যক নয়, ঈশ্বর লাভ করার জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতাই একমাত্র অত্যাবশ্যক। সেটি যার আছে তার অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। ব্যাকুলতাই তাকে লক্ষ্য বস্তুতে উপনীত করাবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধক জীবন এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চিরকালই অবতার পুরুষকে স্বয়ং আচরণ করে দেখাতে হয় যে কিভাবে লক্ষ্যবস্তু লাভ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে দেখিয়েছেন একমাত্র আন্তরিক ব্যাকুলতাই মানবজীবনের সর্বোচ্চ প্রাপ্তির কারণ। সাধনার প্রারম্ভে তিনি কোন প্রথাগত আচার অনুষ্ঠান করেননি। শিশু যেমন তার মার জন্য কাতর হয়, তিনি ঈশ্বর দর্শনের জন্য তেমনি কাতর হয়েছিলেন। আর সেই ব্যাকুলতা সেই আর্তি যেদিন চরমে উঠল সেদিন সেইক্ষণে তিনি ইষ্টের দর্শন লাভ করলেন। এই দিব্য দর্শনের পর তিনি শাস্ত্রানুসারে বিবিধ ধর্মের যথারীতি সাধন করেছিলেন। কারণ তার এক বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিভিন্ন মত, বিভিন্ন পথ যে একই পরম লক্ষ্যে উপনীত করে, এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তাঁর এই সাধনার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু তার আগে কোন শাস্ত্রীয় বিধি, নিয়মনিষ্ঠ পূজাদি ছাড়াই শুধুমাত্র ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁর তীব্র ও অপরিসীম ব্যাকুলতার ফলেই মা তাঁকে দর্শন দেন। তাই পরাসিদ্ধির জন্য তীব্র অনুরাগই যে শ্রেষ্ঠ সাধন, অন্য কিছুর যে প্রয়োজন নেই তা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু তবুও আগে যা বলেছি এখনও বলি, সাধারণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও পথ সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণার প্রয়োজন আছে। তা না হলে বৃথা বহু সময় চলে যায়। টোকিও শহরটা কোথায় না জেনেই যদি আমি রওনা হই তাহলে হয়তো একদিন সেখানে পৌঁছব কিন্তু অকারণ ঘোরাঘুরির পর। কিন্তু পথের নিশানা জানা না থাকলেও অধ্যবসায়, নিষ্ঠা ও ব্যাকুলতাই যে লক্ষ্যে উপনীত করে ভক্তিবাদী আচার্যগণ এই বিষয়টির উপরই বারবার জোর দিয়েছেন। কেবলমাত্র তীব্র ব্যাকুলতার দ্বারাই সিদ্ধিলাভ সম্ভব। নিরবচ্ছিন্ন তন্ময়তা যার আছে ইষ্টদেবতাই তার ভার গ্রহণ করেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত যে সব আলোচনা হলো তার কিছু স্ববিরোধী মনে হতে পারে, কিন্তু কোন্ প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে সেইটি যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে প্রতিটি পথেরই উপযোগিতা অনস্বীকার্য। ভক্তিমার্গে চলতে হলে জ্ঞান-কর্ম-যোগ তিনটিরই প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন এই অর্থে যে তা আমাদের অজ্ঞানতাবশত অকারণ বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে লক্ষ্যপ্রাপ্তিকে ত্বরান্বিত করে। সেইসঙ্গে নারদ যে কথা বলেছেন তাও অতি যথার্থ যে ঐকান্তিক ব্যাকুলতা যে ভক্তিতে আছে সে ভক্তি স্বয়ংই আমাদের ইষ্টপ্রাপ্তির কারণস্বরূপ। তাই তাঁর সিদ্ধান্ত এই যে মুমুক্ষু ব্যক্তির ভক্তিই একমাত্র অবলম্বন। যিনি প্রকৃত ভক্ত তার কোন ভাবেই লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হবার আশঙ্কা নেই। তিনি যে লক্ষ্যে পৌঁছবেনই, এই কথাটাই দেবর্ষি বারবার জোর দিয়ে বলতে চেয়েছেন।

এখানে নারদ ভক্তিমার্গের প্রবক্তা, তাই তিনি বলছেন যে একমাত্র ভক্তিই মুক্তির সাধন। জ্ঞান সম্বন্ধে বা অন্য কোন পথ সম্বন্ধে তাঁর তাই কোন আগ্রহ নেই। তাঁর মতে জ্ঞানপথ অফলপ্রসূ ও নীরস শুষ্ক বিচারমাত্র। তাই বিবেকজ্ঞান একটা জ্ঞান একটা বৌদ্ধিক কল্পনার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে—তার বেশি নয়। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করলেই যে সবাই ব্রহ্ম হয়ে যাবে তা নয়। পাণ্ডিত্য দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা হতে পারে কিন্তু সে ব্রহ্ম হয়ে যায় তা নয়। বেদান্তী তো অনেকেই আছেন, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী কজন?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "শুধু পণ্ডিত কি হবে? যদি বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে।...পণ্ডিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, খড়কুটো মনে হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৯৬৩)

বলবার বিষয় এই যে যার এসব গুণ নেই, সে যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন, সে অন্তঃসারশূন্য।

সুতরাং তাঁদের বক্তব্য যে জ্ঞানবাদী যতই বলুন না কেন যে জ্ঞানের দ্বারা যখনই অজ্ঞানের আবরণ দূর হয় তখনই মুক্তি লাভ হয়, তা ঠিক নয়। কেবলমাত্র জ্ঞানই সব নয়। জ্ঞানী বলেন অজ্ঞানের প্রতিষেধক হচ্ছে জ্ঞান, অতএব জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞান দূর হতে পারে না। প্রত্যুত্তরে ভক্ত মৃদু হেসে বলেন, যদি আমার ভক্তি থাকে ভগবান আমাকে সব কিছু দিতে পারেন। সুতরাং সম্যক জ্ঞান কি তিনি আমাকে দিতে পারেন না? তোমার যুক্তি বিচারের পথ অনুসরণ করার আমার কি দরকার? আমার ভগবান সর্বশক্তিমান, তিনি সব কিছুর মঞ্জুর-কর্তা।

এইভাবে তাঁদের মতে ভক্তি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা যে মোক্ষলাভ হতে পারে না, একথা ভক্ত কখনও ভাবতেই পারেন না। ওদিকে জ্ঞানী তর্ক তোলেন তুমি অর্বাচীনের মতো কথা বলছ। ঈশ্বর কেমন তাই তুমি জান না, আর বলছ তিনি তোমায় মুক্তি দেবেন। এইভাবে দুই মতের মধ্যে অনন্তকাল ধরে বিরোধ চলে আসছে; আজও তার সমাধান হয়নি। অথচ বিরোধের কারণ আর কিছুই না, উভয়ের স্বভাবধর্ম ও মানসিকতার ফারাক মাত্র।

তবে তাঁদের পরস্পরের মত ভিন্ন হলেও এতক্ষণের আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে এর যে কোন একটা পথ আশ্রয় করলেই আমরা চরম লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাই বারবার বলেছেন। যদিও দেখা যায় যে ভক্তিবাদীর কাছে তিনি ভক্তিপথের ও জ্ঞানমার্গীর কাছে জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু তাঁর জীবনে তিনি দেখিয়েছেন যে,

কোন পথই শেষপর্যন্ত তাঁর কাছেই নিয়ে যায়। তিনি একাধারে ন ভক্ত, জ্ঞানী ও কর্মযোগী সব কিছুই।

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় ঃ আচার্যাঃ (আচার্যগণ) তস্যাঃ (সেই প্রেমাভক্তির) সাধনানি নসমূহ প্রাপ্তির উপায়সমূহ) গায়ন্তি (গান করেন—বর্ণনা করিয়া থাকেন)

অর্থ ঃ আচার্যেরা স্তোত্র ও সঙ্গীতদ্বারা প্রেমাভক্তি লাভের য়সমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

তৎ তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয় ঃ তৎ (সেই ঈশ্বর প্রেম) তু (কিন্তু) বিষয়ত্যাগাৎ (ইন্দ্রিয়ভোগ্য ার আসক্তি ত্যাগ থেকে) চ (এবং) সঙ্গত্যাগাৎ (আসক্তি ত্যাগ থেকে) ত হয়]।

অর্থ ঃ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা আমরা যেসব বস্তু ভোগ করি এবং নমস্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের যে আসক্তি—এ দুটি ত্যাগ ত পারলে তবেই ঈশ্বরে অনুরাগ আসে।

অব্যাবৃত-ভজনাৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয় ঃ অব্যাবৃত (নিরবচ্ছিন্ন) ভজনাৎ (ভজনের থেকে)।

অর্থ ঃ নিরন্তর সাধন ভজনের অভ্যাস থেকে অনুরাগ হয়।

লোকেঽপি ভগবদ্গুণশ্রবণকীর্তনাৎ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয় ঃ লোকে অপি (দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রেও) ভগবৎ (শ্রীভগবানের) গুণ (লীলা) শ্রবণ-কীর্তনাৎ (শ্রবণ ও কীর্তন থেকে) [অনুরাগ হয়]।

অর্থ ঃ প্রতিদিনের কাজকর্মের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরের লীলা শ্রবণ ও তাঁর নামগুণগান করলে ভক্তি হয়।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব [ভগবৎকৃপালেশাদ্ বা] ॥৩৮॥

অন্বয় ঃ মুখ্যতঃ (প্রধানত) তু (কিন্তু) মহৎ কৃপয়া এব (মহাপুরুষের অনুগ্রহ দ্বারাই) বা (অথবা) ভগবৎ (শ্রীভগবানের) কৃপালেশাৎ (কৃপারকণা থেকে) [ভক্তি লাভ হয়]।

অর্থ ঃ প্রধানত মহাপুরুষের অনুগ্রহ থেকে অথবা ভগবানের সামান্যতম করুণা হলেই ভক্তি লাভ হয়।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তিলাভের বিভিন্ন পন্থা এই অধিকরণে আলোচিত হয়েছে। ভক্তিপথের আচার্যরা ভক্তিলাভের নানা উপায়ের কথা বলেছেন। নারদ উপরের সূত্রগুলিতে সেই বিভিন্ন উপায়গুলি উল্লেখ করেছেন।

এই বিভিন্ন উপায়গুলি বিশ্লেষণ করলে মূলত তিনটি সূত্র পাওয়া যায়। প্রথমত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের বাইরেও ত্যাগ, অন্তরের থেকেও তাদের প্রতি আসক্তি ত্যাগ। দ্বিতীয়ত, ভগবানে অবিচলিত ভক্তি। তৃতীয়ত, ভগবানের নিরন্তর অনুধ্যান বা তাঁর উদ্দেশে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তির প্রবাহ। এমনকি সাংসারিক কাজে ব্যাপৃত থাকার সময়ও মনটা থাকবে

ভগবদ্বিষয়ক প্রসঙ্গ শ্রবণে ও তাঁর গুণগানে। এইভাবে ভগবৎ চিন্তায় সর্বদা নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে পারলে তা ভক্তিলাভের সহায় হয়। তবে প্রধান কথা মহৎ ব্যক্তির কৃপা ও ঈশ্বরের নামমাত্র করুণা দ্বারাই ভক্তিলাভ সম্ভব।

মহৎকৃপা ও ঈশ্বরকৃপা এই দুটি বিষয়ে বলার তাৎপর্য (হেতু) কি? এমন অনেক সময় হয় যে সৌভাগ্যবশত কোন মহাত্মার সঙ্গে আমাদের দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়। তখন তাঁর পূতসঙ্গ আমাদের মনে ভক্তিভাবের উদ্রেক করে। অথবা আমরা নিজেরাই সাধুমহাত্মার সঙ্গ খুঁজতে খুঁজতে তাঁদের কারও দর্শন পেয়ে গেলে তাঁর আশীর্বাদে ভক্তিলাভ হতে পারে। এই সাধুসঙ্গ অনুসন্ধানটি আমাদের প্রয়াসসাধ্য।

কিন্তু ঈশ্বরকৃপা শেষ কথা। সাধুসঙ্গ অনুসন্ধান না করলেও কখনও তা আপনা আপনি ঘটে। কিন্তু সর্বদাই তাতে ভক্তিলাভ হয় না। একমাত্র ঈশ্বর কৃপা করে আমাদের ভক্তি দিতে পারেন। আমরা জানতেও পারি না, আমাদের যোগ্যতা না থাকতে পারে কিন্তু অযাচিতভাবে তাঁর করুণাধারা নেমে আসে ও তখনই হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। কিন্তু সাধুসঙ্গ যে ভক্তির অবশ্যম্ভাবী কারণ তা কিন্তু নয়। অনেক সময় চাইলেও হয়তো তেমন ঈশ্বরপ্রতিম পুরুষের দর্শন পাই না। কিন্তু ঈশ্বরকৃপা স্বতন্ত্র বস্তু। কখন কিভাবে যে তাঁর কৃপা বর্ষিত হবে তা কেউ জানতে পারে না। হয়তো দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেও তা ব্যর্থ হয়। এই কৃপার কোন শর্ত থাকে না। এ তাঁর অযাচিত অনুগ্রহ। সুতরাং কৃপা লাভের কোন প্রয়াসের উপায় নেই। ভগবদ্ভক্ত মহাজনের শরণাপন্ন হয়ে ভক্তিলাভের জন্য তাঁর কৃপা আমরা প্রার্থনা করতে পারি। কিন্তু মহৎকৃপা লাভ যদি না-ও হয়, ঈশ্বর কৃপা করে আমাদের ভক্তি দিতে পারেন। ঈশ্বর কৃপার মাহাত্ম্য এখানেই যে তা না চাইলেও পাওয়া যায়। কৃপার অর্থই হচ্ছে তা দাতার দিক থেকে

স্বতঃস্ফূর্ত। আমার পাওয়ার মতো কোন গুণ আছে কিনা, যোগ্যতা আছে কিনা কৃপার মধ্যে সেসব শর্তের বিচার থাকে না। কৃপার অর্থই নিঃশর্ত দান। এই কৃপা লাভের জন্য তাঁকে কোথাও খুঁজতে যেতে হয় না বা সাধনার দ্বারাও এ বস্তু লভ্য নয়। কিন্তু তিনি কৃপা করবেন এমন কোন নিয়মও নেই। তাই হয়তো দীর্ঘকাল ধরে কৃপার প্রত্যাশী হয়ে জীবন বৃথাই চলে গেল, তা-ও হতে পারে। এই জন্যই সাধু কৃপা ও ঈশ্বর কৃপা দুটি কথাই বলেছেন। যদিও প্রকৃত সাধু চিনতে পারা ও তাঁর সঙ্গলাভ করা দুরূহ ও দুর্লভ। প্রকৃত সাধু কে তা আমাদের পক্ষে জানা বা বিচার করে দেখা সহজসাধ্য নয়। তার পরেও প্রশ্ন থাকে কেমন করে তাঁর সঙ্গ লাভ করব বা সেই সংস্পর্শে আমাদের পরিবর্তন হবে কিভাবে? এসব কিছুই আমাদের বুদ্ধির অগম্য, ব্যাখ্যার অতীত। তবে যদি প্রকৃত মহাত্মার দর্শন ও সঙ্গলাভ ঘটে তবে তার শুভফল যে ফলবেই এ অবিসংবাদিত সত্য। সৎসঙ্গ কখনও বৃথা যায় না। সুতরাং মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপা যদি আমরা কখনও পাই তবে আমরা জানব এই ভবসমুদ্রে পার হবার পাথেয় আমরা পেয়েছি। এই পবিত্র সঙ্গ যেন আমাদের নতুন জন্ম দেয়—আমাদেরকে ঋষিত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। কিভাবে করে তা আমরা জানতে পারি না—কিন্তু এই অমোঘ পবিত্র সঙ্গ আমাদের মধ্যে পরাভক্তির বীজ বপন করে—এ ধ্রুব সত্য। আর সেইজন্যই ঈশ্বরকৃপা ও মহৎকৃপা দুটির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয় ঃ মহৎসঙ্গঃ (মহৎ ব্যক্তির আশ্রয়) তু (কিন্তু) দুর্লভঃ (সহজলভ্য নয়) অগম্যঃ (উপলব্ধি করা কঠিন) চ (এবং) অমোঘঃ (অব্যর্থ ফল)।

সাধুসঙ্গ লাভ হলে তার ফল কখনো ব্যর্থ হয় না।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূত্রে সাধুসঙ্গের স্তুতি করা হয়েছে।
সঙ্গ লাভ করা সহজ বস্তু নয়। কেন না এমনও হয় যে, হয়
কোন মহৎ ব্যক্তির বাসস্থানের কাছেই আমরা থাকি—ত
আমাদের যোগাযোগ না ঘটতে পারে। কেবল এক পাড়াতে
তা সঙ্গ হলো না। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বা তার কাছাকাছি অ
তো কতজনই বাস করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রতিদিন দেখব
আলাপ করার কত সুযোগ তাঁদের ছিল। তারা কি তাঁর স
যোগ স্থাপন করেছিল? করেননি। এমন কি কর্মোপলক্ষে যাঁ
সংস্পর্শে আসতেন তাঁরাও কিন্তু প্রকৃত সঙ্গ করেননি। সুতর
ফলও পাননি। সাধুসঙ্গের অর্থ দৈহিক সান্নিধ্য মাত্র নয়।
শোনা, তাঁর আচরণ দেখা, তাঁর সেবা ও পরিপ্রশ্ন করা, এই-ই
অর্থ। এই সঙ্গ যদি না থাকে তবে এক স্থানে বাস করলেও
হয় না, কোন ফলও হয় না।

এই প্রসঙ্গে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীর একটি ঘটনা
একদিন স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের কাছে আমরা বসে
সময় এক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, সাধুসঙ্গের জন্য আমার
মহারাজ তখন এই একই মন্তব্য করলেন, দক্ষিণেশ্বরে কালী
কত লোকই বাস করত। মন্দিরের কাছাকাছি তো কতলোকই
সবাই প্রতিদিন শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসত, কিন্তু তাদের
মধ্যে তো কোন ধর্মভাব জাগেনি। এই 'একজন' কথাটির উ

লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ॥ ৪০ ॥

অন্বয় **ঃ** লভ্যতে অপি (প্রাপ্তও হয়) তৎ (ঈশ্বরের) কৃপয়া এব (কৃপার দ্বারাই)।

অর্থ **ঃ** আবার ঈশ্বরের কৃপা থাকলেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়।

তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥ ৪১ ॥

অন্বয় **ঃ** তস্মিন্ (ভগবানে) তজ্জনে (তাঁর ভক্তে) ভেদাভাবাৎ (ভেদের অভাব হেতু)।

অর্থ **ঃ** ভগবান ও তাঁর ভক্তের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই বলেই একের অনুগ্রহেই অপরের অনুগ্রহ পাওয়া যায়।

তদেব সাধ্যতাম্ তদেব সাধ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয় **ঃ** তৎ এব (সেই সাধুসঙ্গই) সাধ্যতাম্ (সাধনা কর)।

অর্থ **ঃ** নিশ্চিতভাবে সেই ভগবদ্ভক্ত ও সজ্জনেরই আশ্রয় গ্রহণ কর।

ব্যাখ্যা ঃ সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেও সেই সৎসঙ্গের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন—এই কথা বলে এবার উপসংহার করছেন। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাবার জন্য একই কথা দুবার উচ্চারিত হয়েছে।

সৎসঙ্গ অতি দুর্লভ একথা নারদ আগেই বলেছেন। আর ঈশ্বরের কৃপা হলে তবেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়। তাছাড়া সাধুর সাহচর্যই যথেষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে চাই হৃদয়ের সংযোগ তথা আধ্যাত্মিক যোগ। নিছক সান্নিধ্যের কোন মূল্য নেই। সুতরাং সকলের পক্ষে তো নয়ই এমনকি তাঁর নিকট সংস্পর্শে বাস করলেও প্রকৃত সঙ্গলাভ হলো না। সাধুসঙ্গ যে শুধু দুর্লভ তা নয়, দুর্বোধ্যও বটে। সৎসঙ্গের প্রভাবে কোন মানুষ যে নিজের অজ্ঞাতসারেই কেমন পরিবর্তিত হয় তা বোঝাই যায় না। কিন্তু এই পরিবর্তন আসবেই—এর প্রভাব অমোঘ। যদিও সে জানতেও পারে না, বুঝতেও পারে না যে তার নিজের কোন প্রয়াস ব্যতীতই কিভাবে একটা পরিবর্তন ধীরে ধীরে তার মধ্যে কাজ করে চলেছে। ভগবদ্ভক্তের সংস্পর্শে তার হৃদয়েও ভক্তির একটা দীপ জ্বলে ওঠে। কেবলমাত্র এই অনুগ্রহই পরাভক্তি লাভের প্রধান উপায়। কিন্তু এই অনুগ্রহ শক্তি ব্যর্থ হয় না—এর পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। মহৎ ব্যক্তির কৃপাকেও আমরা ভগবানের কৃপা বলতে পারি, কারণ তাঁরই কৃপায় আমরা সাধুর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য লাভ করি। আমাদের যোগ্যতা থাক বা না থাক আমাদের জীবন পরিবর্তিত হয়। ভগবান ও তাঁর প্রকৃত ভক্তের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ভক্ত যখন ভগবানকে লাভ করেন, আত্মচৈতন্য ও ঈশ্বরচৈতন্য তখন এক হয়ে যায়। তাঁর আলাদা সত্তা থাকে না। সেইজন্য প্রকৃত ভক্তের সঙ্গ দিব্য সঙ্গ, স্বয়ং ঈশ্বরের স্পর্শ। সাধুর কৃপা ঈশ্বর কৃপারই নামান্তর। সুতরাং দেখা যায় যে ঈশ্বর কৃপাতেই একমাত্র ভক্তিলাভ সম্ভব—দেবর্ষির এই-ই শেষ সিদ্ধান্ত।

এর তাৎপর্য এই যে কোন ব্যক্তি পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে তিনি স্বয়ংই পবিত্র হয়ে যান। এ কথা সঙ্গত এবং স্পষ্ট। কিন্তু এটাও মনে

রাখবার যে এই কৃপা ঈশ্বর কৃপারই প্রকার ভেদ। তাঁরই কৃপা যেন একটি যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসে আর সেই যন্ত্র ও যন্ত্রীই তখন একাত্মা। তাই ঈশ্বর কৃপা ও মহৎকৃপার মধ্যে পার্থক্য নেই। নারদ এইজন্য বলছেন একমাত্র ঈশ্বর কৃপাই তোমার অবলম্বন হোক। ভক্তিই লক্ষ্য ও সেই ভক্তিলাভের জন্য যা যা অনুকূল তাই সাধন করতে হবে। সেই পরমা ভক্তি যা লাভ করলে মানবজীবন ধন্য হবে, সেই পথ অনুসরণ না করে আমরা যেন এই জীবন বৃথা না অপচয় করি। তাই জোর দিয়ে যেন বলতে চাইছেন, কর কর, এখনই কর। এই-ই তাঁর চূড়ান্ত নির্দেশ—সময় যেন বৃথা না বয়ে যায়।

দুঃসঙ্গঃ সর্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয় ঃ দুঃসঙ্গঃ (দুর্জনের সংসর্গ) সর্বথা এব (সর্বপ্রকারেই) ত্যাজ্যঃ (পরিত্যাগ করা উচিত)।

অর্থ ঃ অসৎ সঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

কাম-ক্রোধ-মোহ-স্মৃতিভ্রংশ-বুদ্ধিনাশ-সর্বনাশকারণত্বাৎ ॥৪৪ ॥

অন্বয় ঃ কাম (লালসা) ক্রোধ (তীব্র বিদ্বেষ?) মোহ (বিমূঢ়তা [মিথ্যা মুগ্ধতা]) স্মৃতিভ্রংশ (ঈশ্বরের বিস্মরণ) বুদ্ধিনাশ (বিচারশক্তির অভাব) সর্বনাশ (সম্পূর্ণ বিনাশের) কারণত্বাৎ (হেতু বলে) [অসৎ সঙ্গ পরিহার করা উচিত]।

অর্থ ঃ অসৎ ব্যক্তির সংস্রবে প্রথমে কামনার উদ্ভব। তারপর যথাক্রমে ক্রোধ-মোহ-বিস্মৃতি-বুদ্ধিবিভ্রম ও অবশেষে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। (এইজন্যই অসৎ ব্যক্তির সংস্রব বর্জনীয়)।

তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তে ॥ ৪৫ ॥

অন্বয় ঃ তরঙ্গায়িতা অপি (প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ-এর মতো হলেও) ইমে (এই সমস্ত কামাদি) সঙ্গাৎ (অসঙ্গ সঙ্গ হেতু) সমুদ্রায়ন্তে (সমুদ্রের মতো বিশাল হয়)।

অর্থ ঃ অসৎ সংস্পর্শে এই কামক্রোধাদি প্রথমে ক্ষুদ্র তরঙ্গের মতো সামান্য আকারে দেখা দেয়, পরে ক্রমে তা বিশাল সমুদ্রের আকার ধারণ করে।

ব্যাখ্যা ঃ ইতঃপূর্বে সৎসঙ্গের শুভফল বর্ণনা করে এখন তার বিপরীতে অসৎ সঙ্গের অশুভ দিকটি দেখাচ্ছেন। সাধু ব্যক্তির আশ্রয় যেমন অবশ্য গ্রহণীয় তেমনিভাবেই অসাধু ব্যক্তির সংসর্গ পরিবর্জনীয়। কেন, সেকথা বলেছেন পরের সূত্র দুটিতে। কামক্রোধাদির হেতু বলে অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে। অসৎ ব্যক্তির পরামর্শে প্রথমে আমাদের মনে কাম বা বাসনার উদ্ভব হয়। কাম প্রতিহত হলে হয় ক্রোধ। ক্রোধের ফলে আমরা মোহগ্রস্ত হই হিতাহিত জ্ঞান হারাই। শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ঈশ্বরকে ভুলে যাই। বিচারবুদ্ধির লোপ ঘটে ও সবের মিলিত ফলে ঘোর সর্বনাশ উপস্থিত হয়। এই ক্রমিক বিপর্যয়-এর উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারদ অসৎসঙ্গ থেকে সর্বতোভাবে দূরে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় কিছু বাস্তব সমস্যা আসে। তখন দয়া বা দাক্ষিণ্যবোধে আমরা মাঝে মাঝে বলি অসৎ লোককে এড়িয়ে যাবার কি আছে? সে যদি অসাধু হয় সে নিজের মতো থাক, আমাদের দেখার কি দরকার? অর্থাৎ তার সঙ্গ যেচে করব না কিন্তু তাকে সহ্য করতে দোষ

কি? কিন্তু নারদ সঙ্গত কারণেই এই মতের বিরোধী। আজ যাকে সহ্য করছি, কাল হয়তো তারই দ্বারা প্রভাবিত হব। ক্রমে হয়তো তাকে ভাল লাগতে শুরু হবে। আর সেই ভাল লাগার ফলে তার সঙ্গ করব ও নিজেরাও অসৎ পথে অগ্রসর হব। সৎসঙ্গ যেমন আমাদের মনে ভক্তিভাব জাগিয়ে তোলে, অসৎ সঙ্গ তেমনি জাগিয়ে তোলে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ ইত্যাদি।

গীতাতে ভগবান বলছেন, 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' (গীতা, ২।৬২) অর্থাৎ সংসর্গ তথা আসক্তিই বাসনার মূল। চিত্তাকর্ষক লোভনীয় বস্তুর মধ্যে থাকলে তৎক্ষণাৎ আমরা তার দ্বারা প্রভাবিত না হলেও ক্রমশ তা আমাদের মনের মধ্যে ছাপ ফেলে আর তারপর কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই আমরা এই কামক্রোধলোভমোহসঙ্কুল সংসারের জীব হয়ে পড়ি।

সেইজন্য অসৎ সঙ্গ থেকে আমরা সরে থাকতে পারছি কি পারছি না, সে বিষয়ে সর্তক থাকার দরকার। হয়তো এটা সামান্য নির্মমতা মনে হতে পারে কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাধকের পক্ষে এই অসৎসঙ্গ এড়িয়ে চলা জরুরী—অত্যন্ত জরুরী।

ভক্তি লাভের পথে যখন যথেষ্ট অগ্রগতি হবে তখন আর এই সঙ্গ দোষ তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না কিন্তু সাধনের প্রথম অবস্থায় এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন না করলে মনের অধোগতি অনিবার্য। তাই এই বিষয়টির উপর এখন এত গুরুত্ব দিচ্ছেন।

করুণা দেখিয়ে এ কথা বলা ঠিক হবে না যে পরিস্থিতির সঙ্গে তো মানিয়ে চলতে হবে। সমস্ত অসৎ লোককে দূরে সরিয়ে রাখা তো সম্ভব

নয়, অতএব তাদের সঙ্গে আমাদের থাকতেই হবে। তবে সতর্ক থাকব যেন আমরা তাদের দ্বারা প্রভাবিত না হই। এ দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতার দিক দিয়ে ঠিক আছে কিন্তু সাধকজীবনে এর পরিণামে সর্বনাশ হতে পারে। অসৎ সঙ্গের প্রভাবের শক্তি এতই যে আমাদের অজ্ঞাতসারে তা কখন মনের উপরে ছাপ ফেলে যায়। মনের মধ্যে অজান্তে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে অসৎ ভাবনা, যা ক্রমে ক্রমে তাকে ঈশ্বরবিমুখ করে তোলে। ঠিক যেমন এর বিপরীতে সৎব্যক্তি তাঁর প্রভাবে একজনকে সৎ হতে সাহায্য করেন। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন—যিনি ভালমন্দের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়েছেন, যিনি ঈশ্বরপ্রেমে নিমজ্জিত, এই সঙ্গদোষ তাঁর কোন ক্ষতিসাধন তো করেই না, বরং তাঁর প্রভাবে অসৎ ব্যক্তিরই রূপান্তর ঘটে।

সাধারণের পক্ষে কিন্তু সর্বদাই সাবধানে চলা প্রয়োজন যাতে কুসঙ্গের প্রভাব থেকে সে মুক্ত থাকে। অন্যথায় তা সাধনক্ষেত্রে অবনতি ও ঈশ্বরের পথ থেকে বিচ্যুতির কারণ হতে পারে। সাগরের জলে বুদ্‌বুদ্ ওঠার মতো সাধকেরও প্রথম দিকে কামক্রোধ থাকতেই পারে কিন্তু কুপ্রভাবে তা বর্ধিত হবার আশঙ্কা প্রবল।

ভক্ত হলেও তার ভাল-মন্দ দুয়ের প্রবণতা থাকাই সম্ভব। অসৎ প্রকৃতিগুলি থাকে সুপ্তাবস্থায়। তাই সেগুলি কার্যকরী হয় না। মনকে প্রভাবিত করে বিপথগামী করে না। এই তরঙ্গ রূপ চিত্তবৃত্তিগুলির তিনি তখন দ্রষ্টা মাত্র। গীতাতেও এই উপদেশ দিয়েছেন যে সাধনের প্রথমাবস্থায় এইসব বিভিন্ন বৃত্তির উদয় ও লয় হয়েই থাকে কিন্তু সাধক যদি সচেতন থাকেন, সর্বদাই উচ্চভাবে স্থিত থাকেন তবে এ বৃত্তিগুলি বৃত্তিমাত্রই থাকবে ও মনে কোন প্রভাব বা প্রক্ষোভ সৃষ্টি না করতে পেরে

আবার আপনিই লয় প্রাপ্ত হবে। তারা তাঁর গতি প্রতিহত করতে বা ঈশ্বর ভাবনা থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হবে না।

কথাতেই বলে যে অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আমাদের মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিকে সে সমুদ্রে পরিণত করে। তাই অসৎ ব্যক্তির সাহচর্যে আমাদের সাবধানে থাকা অবশ্য প্রয়োজন। এই তরঙ্গগুলিই হচ্ছে কাম-ক্রোধ-মোহ, কুপ্রভাবে যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পায় যে আমাদের পক্ষে সেগুলিকে সংযত করা কঠিন হয়। সুতরাং সদাসতর্ক থেকে সবর্তোভাবে কুসঙ্গ বর্জন করা দরকার। আমি যথেষ্ট দৃঢ়চেতা, অতএব আমি প্রভাবিত হব না, এ কথা কখনও ভাবা উচিত নয়। এই ধরনের আত্মপ্রসাদই সর্বনাশ ডেকে আনে।

কস্তরতি কস্তরতি মায়াম্? যঃ সঙ্গাংস্ত্যজতি,
যো মহানুভবং সেবতে, যো নির্মমো ভবতি ॥ ৪৬ ॥

অন্বয় ঃ কঃ (কে) মায়াম্ (মায়াকে) তরতি (অতিক্রম করেন) যঃ (যিনি) সঙ্গান্ (অসৎ সঙ্গ) [সঙ্গ অর্থে শুধু অসঙ্গ সঙ্গ ধরা হবে না অসৎ সঙ্গ ও আসক্তি দুইই?] ত্যজতি (ত্যাগ করেন) যঃ (যিনি) মহানুভবং (মহৎ ব্যক্তিকে) সেবতে (সেবা করে) নির্মমঃ (মমত্বত্যাগী বা নিরহঙ্কারী) ভবতি (হন)।

অর্থ ঃ এই বিশাল মায়াবারিধিকে অতিক্রম করতে তিনিই সমর্থ যিনি অসৎজনের সঙ্গ ত্যাগ করেছেন, যিনি মহাপুরুষদের সেবা করেন ও যাঁর অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়েছে।

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি, যোগক্ষেমং ত্যজতি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) বিবিক্তস্থানং (নির্জন স্থানে) সেবতে (বাস করেন) যঃ (যিনি) লোকবন্ধম্ (লৌকিক সম্পর্কজনিত বন্ধন) উন্মূলয়তি (নির্মূলভাবে ছিন্ন করেছেন) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (সত্ত্বাদি তিনগুণের যিনি বশ নন) যোগক্ষেমং (জাগতিক বস্তুর প্রাপ্তি এবং তা রক্ষণ করার প্রয়াস) ত্যজতি (ত্যাগ করেছেন)।

অর্থ ঃ যিনি নিভৃতস্থানে বাস করেন লৌকিক বন্ধন ছিন্ন করেছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণকে যিনি অতিক্রম করেছেন এবং পার্থিব কোন বস্তুর প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা বা প্রাপ্তবস্তুর রক্ষার চেষ্টা যিনি ত্যাগ করেছেন (তিনিই মায়া অতিক্রম করতে পারেন)।

যঃ কর্মফলং ত্যজতি, কর্মাণি সংন্যস্যতি, ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) কর্মফলম্ (কর্মফল) ত্যজতি (ত্যাগ করেন) কর্মাণি (কর্মসমূহ) সংন্যস্যতি (পরিত্যাগ করেন) ততঃ (তার ফলে) নির্দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্বরহিত) ভবতি (হন)।

অর্থ ঃ যিনি কর্মফল ত্যাগী, যিনি এই ত্যাগের দ্বারা দ্বন্দ্বশূন্য (দ্বৈতবোধ বিরহিত) হয়েছেন তিনিই [মায়া অতিক্রম করেন]।

যো বেদানপি সংন্যস্যতি,
কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) বেদান্ অপি (বৈদিক ক্রিয়াকলাপও) সংন্যস্যতি (পরিত্যাগ করেন) কেবলম্ (কেবলমাত্র) অবিচ্ছিন্নানুরাগম্ (নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ) লভতে (লাভ করেন)।

অর্থ ঃ যিনি বেদবিহিত কর্মাদির অনুষ্ঠান ত্যাগ করেছেন এবং যাঁর কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন ইষ্ট প্রীতি আছে তিনিই [মায়া অতিক্রম করেন]।

স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০ ॥

অন্বয় ঃ সঃ (তিনিই) তরতি (মায়াকে অতিক্রম করেন) লোকান্ (অন্যান্য ব্যক্তিদেরও) তারয়তি (অতিক্রম করান)।

অর্থ ঃ (উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট) সাধক কেবলমাত্র যে নিজে এই ভবসাগর পার হন তা নয়, অপরকেও পার করতে সাহায্য করেন।

ব্যাখ্যা ঃ উপরের সূত্রকটির আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যে এই দুস্তর মায়াজলধি উত্তীর্ণ হতে সক্ষম কে? **প্রথমত**—যিনি দুর্জন সঙ্গ পরিত্যাগ করেছেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে আসক্তি ত্যাগ করেছেন, রিপু সংযম করেছেন।

দ্বিতীয়ত—যিনি ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের সেবা করেন। গীতাতেও এই কথা বলা হয়েছে, 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া'। (গীতা, ৪।৩৪) অর্থাৎ যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা মহাপুরুষের নিত্য সঙ্গ

করেন তিনিই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন। ঐকান্তিক নিঃস্বার্থ সেবাই আমাদের মনকে সাধু মহাত্মার কৃপা লাভের যোগ্য করে। একথার অর্থ এ নয় যে সেবার দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হবেন তবে কৃপা করবেন। তাঁর কৃপা অহৈতুকী। কিন্তু সেই কৃপা গ্রহণ করার যোগ্যতা চাই। যখন আমরা কোন মহাপুরুষের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তখন দেখা যায় তাঁর অন্তর থেকে যে মহৎ ভাবগুলি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই তত্ত্ব আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। সেবার মধ্য দিয়েই আমাদের সেই ভাবগুলির গ্রহণযোগ্যতা হয়। সেবার তাই বিশেষ মূল্য আছে। যাঁকে সেবা করছি তাঁর জন্য নয়, যিনি সেবা করছেন তাঁর নিজের জন্যই করেন। এই সেবার দ্বারাই তাঁর মনের আগল খুলে যায়, এই মহৎ ভাবনা হৃদয়ঙ্গম করার প্রস্তুতি তাঁর হয়।

তৃতীয়ত—যিনি আমিত্ব ও মমত্ববোধ ত্যাগ করেছেন তাঁর কথা বলা হচ্ছে। অধিকারবোধ নিঃশেষে ত্যাগ করতে হবে। যতক্ষণ আমি ও আমার এই অহংবোধ প্রবল থাকবে ততক্ষণ তাঁর কৃপা আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারবে না। আমাদের এই আধারে তাঁর কৃপা গ্রহণ করব, কাজ করতে দেব মনের মধ্যে এই গ্রহণযোগ্যতা আগে দরকার। কিন্তু অধিকারবোধ থাকা পর্যন্ত এই মনোভাব সম্ভব নয়। কোন একটা বস্তুকেও আমার বলে জানলেই অন্য অনেক বস্তুর প্রতিই আকাঙ্ক্ষা আসে, আমার নিজের বলে তা পেতে ইচ্ছা করে। 'আমিত্ব' ও 'আমার' এই বোধ মনকে আচ্ছন্ন করে থাকার ফলে তাঁর কৃপা আর সেখানে প্রবেশের পথ পায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "নিচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমি থেকে জল গড়িয়ে চলে আসে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৫৮৭) "... উঁচু জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নিচু জমিতে—খাল জমিতে জমে।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১১০৯) সেই জমিতে বীজ থেকে অঙ্কুর হয়, গাছ হয়, তারপর ফল ধরে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, দুটি বস্তু দরকার। একটি কৃপা ধারণের অনুকূল মনোবৃত্তি, অপরটি দৈন্যবোধ। মহৎকৃপা বা ঈশ্বরকৃপা লাভ করতে আমরা ইচ্ছুক, অথচ আমিত্ব ও মমত্ববোধ আছে পূর্ণমাত্রায়, তবে সে কৃপা ধারণ করতে আমরা সক্ষম হব না। [অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে দীনতা অবলম্বন করতে হবে।]

প্রশ্ন ছিল মায়ার সাগর কে উত্তীর্ণ হতে পারেন? সিদ্ধান্ত হলো—

১। যিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেছেন।

২। যিনি ভগবদ্ভক্ত বা মহাপুরুষের প্রতি সেবাপরায়ণ।

৩। যিনি অধিকারবোধ ত্যাগ করেছেন।

৪। যিনি নিভৃত ও পবিত্রস্থানে বাস করেন।

যাতে চিত্তবিক্ষেপ না হয়ে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় তারজন্য এই শেষের শর্তটি বিশেষ জরুরী। সমাজের হইচই-এর মধ্যে বা সর্বক্ষণই বৈষয়িক আলোচনায় মত্ত সাংসারিক লোকেদের মধ্যে মন সহজেই বিক্ষিপ্ত হয়। সুতরাং প্রথমেই এমন একটি জায়গার সন্ধান করতে হবে যেখানে এ রকম বিক্ষেপের সম্ভাবনা থাকবে না। পুণ্যস্মৃতি বা পূতসঙ্গ জড়িত কোন তীর্থস্থানই এখানে শ্রেয়। মন সহজেই এসব জায়গায় ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তাই নির্জন স্থান একান্ত প্রয়োজন।

৫। ত্রিলোকের ভোগ-সুখের বন্ধন যিনি জয় করেছেন।

ত্রিলোকের অর্থ এই ভূলোক ও এর উপরের দুই লোক। একটি হচ্ছে উভয়ের মধ্যবর্তী অন্তরীক্ষ লোক ও অপরটি হচ্ছে অন্তরীক্ষের ঊর্ধ্বে অবস্থিত দ্যুলোক—দেবদেবীদের বাসভূমি। দিব্য আনন্দ উপভোগ

করার জন্য লোকে এই দ্যুলোক বা স্বর্গে বাস করতে চায়। তাই আমাদের কেবল এই পৃথিবীর ভোগ সুখ ত্যাগ করলেই চলবে না। স্বর্গসুখ বা তারও উপরে যে সমস্ত লোক আছে, যেখানকার সম্বন্ধে শোনা যায় যে, সেখানে যে আনন্দ লাভ করা যায় তা গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকেই উচ্চস্তরের এবং তার স্থায়িত্বও অনেক বেশি। সে আনন্দের বাসনাও ত্যাগ করতে হবে। এই তিনটি লোকই মূলত ভোগের স্থান। সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত ভোগসুখের বাসনা মন থেকে নির্মূল করতে হবে। সর্বদা সুখের প্রত্যাশা মনের একটা ধর্ম। এই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত করা অবশ্য প্রয়োজন। এই অত্যাবশ্যকতা বোঝাবার জন্য 'উন্মূলয়তি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কেবল দূর করা নয় এর মূলই উৎপাটিত করতে হবে। তা নাহলে আবার শিকড় থেকে যেমন গাছ জন্মায় তেমনি বাসনা আবার জেগে উঠতে পারে। ভোগ্যবস্তু প্রত্যক্ষভাবে আমাদের বন্ধনের কারণ হয় সত্যি কিন্তু ভোগের বাসনার জড় আরও গভীরে। সেটি না উৎপাটিত করলে বাসনার অঙ্কুর আবার মাথা তুলবে।

৬। যিনি ত্রিগুণাতীত।

তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এই তিন গুণই একত্রে এই জগতের মূলে, সৃষ্টির মূলে, সবকিছুর মূলে অবস্থিত। এই তিন গুণই জীবের বন্ধনের হেতু।

'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥' (গীতা, ১৪।৫)

এই শ্লোকেও তিনটি গুণের [illegible]
তমঃ হচ্ছে জড়ত্ব, রজঃ হচ্ছে কর্মচাঞ্চল্য—[illegible]
কর্মে প্রবৃত্ত করে। আর সত্ত্বগুণ ভাললাগার বস্তুতে [illegible]
সত্ত্বগুণ সুখ দেয় এবং সেই সুখে বদ্ধ করে। রজঃগুণ দুঃখের [illegible]
এবং আমাদের তামসিকতা বা জাড্যের মূলে তমঃগুণ। সুতরাং এই তিনটি
গুণকেই বশীভূত করে যিনি নিস্ত্রৈগুণ্য বা ত্রিগুণাতীত হতে পারেন তিনিই
'দুরত্যয়া' মায়া অতিক্রম করেন।

৭। যিনি যে কোন বস্তুর প্রাপ্তির বা প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন।

কিছু কিছু জিনিস আছে যা আমাদের স্বতঃপ্রাপ্ত। সাধারণত সে সব বস্তু আমরা রক্ষা করে থাকি। আবার অনেক কিছুই যা আমাদের নিজের নেই অথচ পেতে চাই। এই অপ্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি আর প্রাপ্তবস্তুর রক্ষার প্রয়াস, এ বাসনারই দুটি দিক। তাই যা আমাদের আছে বা যা আমাদের নেই দুটি সম্বন্ধেই যাঁর কোন মোহ নেই, দুটিই যিনি ত্যাগ করেছেন তাঁর পক্ষেই মায়ার হাত থেকে মুক্তি সম্ভব।

৮। যিনি কর্মফল ত্যাগ করেছেন।

আমরা যখনই যে কাজই করি না কেন তার ফল পাবার ইচ্ছা থেকেই যায়। ভক্তকে কিন্তু সমস্ত কর্মেরই ফল ত্যাগ করতে হয়। অর্থাৎ নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির প্ররোচনা তাঁর কোন কাজেই থাকা চলবে না। কর্ম করা চলে, কিন্তু তা করতে হয় অনাসক্তভাবে, নিঃস্বার্থভাবে, নিজের কোন লাভ হবে—এই আশায় নয়। এই রকম কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, আমাদের বদ্ধ করে না। অন্যথায় নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে

কর্ম তা মোহগ্রস্ত করে বদ্ধ করে। তাই মায়াকে অতিক্রম করতে হলে কর্মফল ত্যাগের প্রয়োজন।

৯। যিনি সর্বকর্মপরিত্যাগী।

এখানে 'কর্ম' শব্দের অর্থ শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান। এই আচার অনুষ্ঠান মনকে বিক্ষিপ্ত করে। সেইজন্য এগুলি ত্যাগের কথা বলা হয়েছে। এগুলি ত্যাগ করলে অনুষ্ঠানজনিত সুখদুঃখাদির দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকতে পারব ও মায়াতীত হতে পারব।

১০। ঈশ্বরের প্রতি যাঁর অনুরাগ নিরবচ্ছিন্ন ও অপ্রতিহত।

অর্থাৎ ঈশ্বরলাভের ইচ্ছা যেন কোন ভাবেই প্রশমিত না হয় বা স্তিমিত না হয়ে যায়। একমুখী ভাব যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। ঈশ্বরোপলব্ধির জন্য অন্তরে সুতীব্র এক আবেগ থাকবে যা দীপশিখার মতো অনির্বাণভাবে নিরন্তর জ্বলতে থাকবে। অথবা এক পাত্র থেকে অপর পাত্রে যেমন তৈলধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে পতিত হয় তেমনই অবিচ্ছিন্ন হবে তাঁর প্রতি প্রেম প্রবাহ। এই বিরামবিহীন অবিক্ষিপ্ত ঈশ্বরের অনুধ্যানেই মন তাঁকে লাভ করবার জন্য প্রস্তুতি অর্জন করে। ভগবানকে লাভ করবার জন্য সহজ ও সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত ফলপ্রদ কটি সাধনপন্থা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আমরা বুঝতে পারব না কিংবা অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য এমন কিছু সাধনের কথা বলা হয়নি। হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে এই নিরবচ্ছিন্ন ভগবদেষণা সম্ভব কি না? উত্তরে বলি, তা সদ্যই সম্ভব নয় একথা সত্য কিন্তু তার জন্য চেষ্টা করে যেতে হয়। তাঁকে নিরন্তর স্মরণ ও অব্যবহিত ভজনের জন্য কঠোর প্রয়াস যদি করা যায় তবেই আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হব। সামর্থ্যের অর্থ তখনই কেবল আমরা তাঁর কৃপার যোগ্য

হব। অবশ্য তাঁর কৃপা বাতাস তো বইছেই। বলা চলে সেই কৃপা গ্রহণের বা ধারণের সামর্থ্য আমাদের হবে। আর তা না হলে সে কৃপা বৃথাই ফিরে যায়, আমাদের জীবন সার্থক হয় না। অন্যথায় কিন্তু তাঁর কৃপা ব্যর্থ হয় না, নগণ্য মানবকে তা দেবমানব করে তোলে। লক্ষ্যবস্তুর দিকে অগ্রসর হবার জন্য তাই এই সমস্ত নির্দেশ নিষ্ঠাভরে পালন করে যেতে হবে। তবে সেই সঙ্গে এ-ও মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরলাভের প্রত্যক্ষ হেতু এগুলি নয়, তাঁর কৃপাই হচ্ছে প্রধান। আমাদের সমস্ত সাধনা সেই কৃপা লাভের যোগ্য করে নিজেদের গড়ে তোলা। যে সাধনগুলির কথা বলা হয়েছে তা অত্যন্ত সহজ ও যুক্তিপূর্ণ। কোন দার্শনিক কচকচি না থাকায় এগুলি পালন করবার জন্য কোন পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয় না। এখন আমরা যথাসাধ্য পালন করব কি না সে তো ব্যক্তিগত বিষয়। যদি করা হয় তবে তাঁর কৃপায় সিদ্ধি অনিবার্য এই নিশ্চিত আশ্বাস দেবর্ষি দিয়েছেন। যা কিছুই আমরা লাভ করি সবই তাঁর কৃপায়। এই পরমবস্তু লাভও তাঁরই কৃপা ব্যতীত সম্ভব নয়। তিনিও কৃপা করার জন্য সর্বদা উন্মুখ। তাই আমাদের সমস্ত সাধনের উদ্দেশ্য সেই কৃপা গ্রহণ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা।

এই প্রসঙ্গটি এখানেই সমাপ্ত এটি বোঝাবার জন্য সূত্রস্থ ‘সঃ তরতি’ বাক্যটি দুবার উচ্চারিত হয়েছে।

অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয় ঃ অনির্বচনীয়ম্ (বর্ণনাতীত) প্রেমস্বরূপম্ (প্রেমের স্বরূপ)।

অর্থ ঃ প্রেমের স্বরূপ ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২ ॥

অন্বয় ঃ [এই প্রেম] মূক (বোবা ব্যক্তির) আস্বাদনবৎ (অনুভূতির ন্যায়)।

অর্থ ঃ বোবা যেমন অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না, প্রেমও তেমনি কেবল নিজের অনুভূতিগম্য।

ব্যাখ্যা ঃ পরাপ্রেম কি বস্তু তা বোঝাতে গিয়ে প্রথমেই বলা হচ্ছে যে এ বোঝানো যায় না। প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা অসাধ্য। নানাভাবে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়ে বা বর্ণনার মাধ্যমে যতই চেষ্টা করা হোক না কেন এর স্বরূপ অনুদ্ঘাটিতই থেকে যাবে। কেন? একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে কারণটা বলেছেন। এ হলো বোবার রসাস্বাদনের মতো। একজন বোবা মানুষ যখন কোন মিষ্ট বস্তু আস্বাদন করে তার একটা আনন্দের অনুভূতি নিশ্চয়ই হয় কিন্তু সে মুখে তা প্রকাশ করতে পারে না। তার ভাল লাগছে কিন্তু বোবা বলে ভাষায় সে ভাল লাগার ধরনটা বোঝাতে পারছে না। পরাপ্রেমও তেমনি এক স্বসংবেদ্য অনুভূতি। সে মূকই হোক আর বাক্‌পটুই হোক দিব্যপ্রেমের অনুভূতিকে ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এই দিব্যপ্রেম তো দূরের কথা, দৈনন্দিন জীবনের ভালবাসার স্বরূপ কি অপরকে বোঝানো যায়? যায় না। কেন না ভালবাসা এমন এক মৌলিক বস্তু যাকে বিশ্লেষণ করা বা 'এরকম-ওরকম' বলে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। মা তাঁর সন্তানকে ভালবাসেন। এখন এক দার্শনিক যদি এসে প্রশ্ন করেন, তোমার এ ভালাবাসা বলতে কি বোঝায় বলতে পার? মা স্বভাবতই বলবেন, না। এ আমার অনুভব, মুখে কি বলব? আর সেই অনুভব যখন ঈশ্বরমুখী হয় তখন তা আরও অনির্বাচ্য।

নানাভাবে বর্ণনা দিলেও এ ভালবাসার অনুভূতি কোনদিন যার হয়নি তার কাছে সে বর্ণনার কোন অর্থই হয় না। সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ যে কি বস্তু তা আর একজন মা-ই একমাত্র বুঝতে পারেন। কারণ তাঁর নিজেরও যে সেই অনুভূতি আছে। কিন্তু অপরকে সে রসের আস্বাদ দেওয়া যায় না। তাকে বলতে হয়, 'তুমি যখন মা হবে বুঝবে।' একজন মা-ই আর একজন মায়ের স্নেহ বুঝতে পারে—অন্যরা হয়তো সেখানে বিদ্রূপ করে বলে, এ আবার কি। ছেলে নিয়ে এত আদিখ্যেতা কিসের?

ঈশ্বর প্রেমের ক্ষেত্রে এই একই ব্যাপার। ঈশ্বর প্রেম অনির্বচনীয়। যাঁর এই প্রেমের অনুভূতি হয়েছে তিনিই অপরেরটি বোঝেন। আর যাদের সে অনুভূতি হয়নি তারা পরিহাস করে বলে, এ আবার কি ঢং?

এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগের এক ঘটনার কথা বলি। দীক্ষালাভের জন্য এক জায়গায় অনেকে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একটি মেয়ের সঙ্গে তার শিশুটি ছিল। সে শিশুটিকে আর একজনের কাছে রেখে দীক্ষা নিতে এল। দীক্ষার মধ্যবর্তী অবসরে বাচ্চাটির কান্না শুনতে পেয়ে সে বাইরে যেতে চাইল। অন্যরাও কান্নার আওয়াজ পেয়েছিল কিন্তু তা গ্রাহ্য করেনি। মার মন কিন্তু বিচলিত হয়ে উঠল। সে বাইরে যাবার উপক্রম করতে ছেলের বাবা এসে তাকে নিবৃত করতে চায়, বলে যে সে বাচ্চাটিকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। মেয়েটি তো স্বামীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। একজন ব্রহ্মচারী মধ্যস্থতা করতে এলেন—মেয়েটি সরাসরি বলল, দয়া করে আপনি এর মধ্যে আসবেন না, আপনি এ বুঝবেন না। আমার মেয়েটির ভাব ভাল লাগছিল। সন্তানের প্রতি মার স্নেহ যে কি জিনিস তা আমরা বুঝতে পারি না, সে ভালবাসায় তখন অন্য সব ভুল হয়ে যায়। একই ভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ যখন হয় সে অনুরাগ হয় আরও তীব্র।

মাতৃস্নেহ থেকে অনন্তগুণে তীব্র। মাতৃহৃদয়ের কথা যেমন আর একজন মা-ই বুঝতে পারেন, অন্য কেউ নয়, ঈশ্বর লাভের জন্য এই তীব্র ব্যাকুলতাও তেমনি অন্য কারও পক্ষে তা বোঝা সম্ভব নয়। একমাত্র সম-অনুভূতিসম্পন্ন অপর কোন ঈশ্বরোন্মাদ ব্যক্তির পক্ষেই তা বোঝা সম্ভব। যদি কেউ ব্যাখ্যা করতে বলেন, আমরা পারব না। বড়জোর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতকগুলো কথা বলতে পারি যে এতে অশ্রুপুলকাদি হয়, অস্থিরতা আসে, মনে কোন শান্তি থাকে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে যা দেখা যায় এমন কতকগুলি লক্ষণ। কিন্তু তাতে প্রেমের স্বরূপ বোঝানো যায় না। সে অনুভূতি অন্তরের এমন অন্তস্তলে থাকে যে তাকে ভাষায় সীমাবদ্ধ করা, বুদ্ধি দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায় না। তাই বলছেন, এটি 'মূকাস্বাদনবৎ।' যে বোঝে সে বোঝে, কিন্তু অপরকে বোঝাতে পারে না।

প্রকাশতে ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয় ঃ প্রকাশতে (প্রকাশিত হয়) ক্ব অপি (কোন কোন) পাত্রে (আধারে)।

অর্থ ঃ এই প্রেম কোন কোন সার্থক সাধকের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়।

ব্যাখ্যা ঃ সাধনার দ্বারা যিনি নিজেকে এই ভক্তিলাভের যোগ্য করে তুলেছেন তিনি যে বর্ণ, যে শ্রেণীরই হোন ভক্তি স্বয়ং তাঁর হৃদয়ে প্রকাশিত হন [ভক্তিই ভক্তকে বরণ করেন]। এ বস্তু অর্জন করে পাবারও নয়। এই পরমধন গ্রহণের যোগ্যতা যাঁর হয়েছে, তাঁর মধ্যে এই স্বয়ংসিদ্ধা ভক্তি বিকশিতা হন।

সে রকম যোগ্য আধার অতি দুর্লভ। তবে তেমন [illegible] ব্যক্তির মধ্যেই এই অনির্বচনীয়া বুদ্ধির অগম্য প্রেমভক্তির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

এখানে স্বভাবতই এই মর্মে একটি আপত্তি উঠতে পারে যে, যার কোন সংজ্ঞাই নির্ধারণ করা যায় না, যার স্বরূপ কারও পক্ষে বর্ণনা করাই সম্ভব নয়, আর করলেও শ্রোতার তা বোধগম্য হয় না—সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করে লাভ কি? লাভ এই যে, দুর্লভ হলেও পরাভক্তি বলে একটি বস্তু আছে, তা বর্ণনাতীত হলেও তার অস্তিত্বে যাতে কেউ সন্দিহান না হন সেইজন্য এত আলোচনা। সেইজন্য অধিকারির মধ্যে এই ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূতা হন। যদিও অনুভূতির যে আস্বাদ তা অপরকে বোঝানো যায় না, তবে সেই দুর্লভ সাধকের আচার আচরণে এই অনন্যা ভক্তির প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়।

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানম্
অবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরম্ অনুভবরূপম্ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয় ঃ গুণরহিতম্ (ত্রিগুণের অতীত) কামনারহিতম্ (বাসনাবিহীন) প্রতিক্ষণবর্ধমানম্ (প্রতিমুহূর্তেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত) অবিচ্ছিন্নম্ (নির্বাধ) সূক্ষ্মতরম্ (অতিসূক্ষ্ম) অনুভবরূপম্ (আন্তর অনুভূতি)।

অর্থ ঃ সত্ত্বাদি তিনগুণের অতীত ও সর্ববিধ বাসনাবিহীন, সর্বদাই যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, যা নিরন্তর প্রবহমান সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিবিশেষই প্রেম।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূত্রে প্রেম কি বস্তু তারই একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রেমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণের কোনটাই থাকে না। থাকে না অন্য কোন বাসনা কামনা। এ প্রেম নিত্যই বর্ধিত হয় এবং এর প্রবাহ নিরন্তর গতিমান থাকে—অন্য কোন মনোবৃত্তি এর গতিতে বাধা সৃষ্টি করে না। এ প্রেম অতি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর এবং তা একমাত্র নিজেরই অনুভূতিবেদ্য।

অনির্বচনীয় প্রেম কেমন তারই কিছুটা আভাস দেবার জন্য এই লক্ষণগুলি বলা হয়েছে। এই প্রতিটি বিশেষণই সেই পরমপ্রেমের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। জ্ঞানীর লক্ষণ বলার সময় বলা হয় তিনি নিস্ত্রৈগুণ্য। তেমনি যাঁর নির্মল হৃদয়ে ভক্তি প্রকাশিত হন তিনিও ত্রিগুণকে অতিক্রম করেন।

এই তিনটি গুণেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমটি হলো সত্ত্বগুণ যা জীবনকে সুখে আপ্লুত করে। এ সুখ বিষয়সুখ ও ক্ষণিক। আসে ও মিলিয়ে যায়। এই হলো সেই সুখের প্রকৃতি যা প্রথম গুণ সত্ত্ব থেকে উদ্ভূত হয়।

দ্বিতীয় গুণ রজঃ। এর ধর্ম রাগাত্মিকা। এ জীবকে কর্মে প্রবৃত্ত করে। ভক্ত রজঃ গুণের ঊর্ধ্বে এ কথার অর্থ এ নয় যে তিনি অলস বা নিষ্ক্রিয়। এর অর্থ তিনি নিরন্তর ঈশ্বরচিন্তাতেই নিমগ্ন থাকেন, তাই বহির্জগতের কাজকর্মে তাঁর পক্ষে লিপ্ত হওয়া সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, প্রমাদ বা জাড্য তমঃগুণের বৈশিষ্ট্য। ভক্ত কিন্তু জড় নন, স্থাণু বা পাষাণের মতো নিষ্ক্রিয়তা তাঁর মধ্যে নেই। জাড্যের অর্থ বোধহীনতা, মনের এ এক নিদ্রিত অবস্থা। সর্ববিধ কর্ম থেকে সরে আসাই প্রমাদ। ভক্ত কিন্তু এক সর্বগ্রাসী ঈশ্বরপ্রেমের অনুভূতিতে সদা জাগ্রত।

এইভাবে তিনি ত্রিগুণাতীত ও সর্বকামনারহিত। দ্বিতীয় কোন বস্তুর মূল্যই নেই তাঁর কাছে তাই তাঁর কিছু চাওয়াও নেই। তাঁর মন ঈশ্বরে এমনভাবেই ওতপ্রোত যে অন্য কোন বস্তুর প্রয়োজনই তিনি অনুভব করেন না। সেইজন্যই বহির্জগতের কোন বিষয়ই তিনি কামনা করেন না। কিন্তু বাইরের বিষয়ে আসক্তি না থাকলেও মনের গোপনে আমাদের সুখানুভূতি বা অন্য কোন আবেগের পরিতৃপ্তির ইচ্ছা থাকতেও পারে। ভক্তের ক্ষেত্রে তা-ও থাকে না কারণ তাঁর মন ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসায় এমন পরিপূর্ণ থাকে যে অন্য কোন আবেগজনিত আনন্দের সংস্পর্শও সেখানে আসে না। আর এই প্রেমের সব থেকে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, তা ক্রমশ বেড়েই চলে আর তীব্রতর হতে থাকে। এ প্রেমের ভাণ্ডার অসীম—এই প্রেমের ধারায় কোন বিরতি নেই—আর এ ধারা নিত্য পরিবর্ধনশীল।

বিবিধ লক্ষণের দ্বারা যা বাক্যের অতীত, এইভাবে তার স্বরূপ এতক্ষণ নির্ণয় করার একটা চেষ্টা আমরা করলাম। এই প্রয়াসের সারমর্ম হচ্ছে—প্রেম ত্রিগুণের ঊর্ধ্বে এবং স্বার্থযুক্ত কোন কর্মের প্রবণতা এই প্রেমে নেই। এটি প্রেমিকের একান্তই স্বসংবেদ্য অভিজ্ঞতা—স্বজ্ঞা। এই প্রেম জগতের সূক্ষ্মতম বস্তু থেকে সূক্ষ্ম হয়েও উপযুক্ত আধারে প্রকাশিত হয় ও আপনা থেকেই প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। একবার প্রেমের উদয় হলে তা সেখানেই থেমে থাকে না। প্রেমের প্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে ও নিরবচ্ছিন্ন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে। প্রেম স্থিতিশীল স্থির একটা আবেগ মাত্র নয়, গতিশীল প্রাণবন্ত চিত্তবৃত্তি। যত বিস্তৃতভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক না কেন এর স্বরূপ বোঝানো অসম্ভব। ভক্তের হৃদয়ে এ প্রেম হঠাৎ আসে আর হঠাৎ চলে যায় এমন নয়, তাঁর হৃদয়ে এ প্রেমের

চিরস্থায়ী আসন পাতা। ভক্তহৃদয়ে এ প্রেম চিরবর্ধনশীল। তাঁর সত্তার প্রতিটি মুহূর্তই ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে রঞ্জিত।

ঐহিক সমস্ত প্রেম সম্বন্ধেই বাসনার সংস্রব থাকে। এক্ষেত্রে কিন্তু কোন ঐহিক বাসনার লেশ নেই। একবার যদি ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের উদয় হয় তবে তা প্রবাহিত হতে থাকে একমুখী গতিতে। ভক্ত তাঁর ভালবাসা উজাড় করে শুধু দিতে চান—কোন প্রতিদানের আশা তাঁর থাকে না।

তাঁর দিয়েই সুখ। তিনি দাতা মাত্র। প্রতিগ্রহীতা নন। তিনি ভিখারি নন—ঈশ্বরের দরবারে তিনি কোন ভিক্ষা চান না। তিনি তাঁর অন্তরস্থিত প্রেমের অবাধ গতিকে ঈশ্বরের অভিমুখী করে দেন। তাঁর এ প্রেমের ধারা চিরস্রোতা ক্রমস্ফীতমানা নদীর মতো। পরম প্রেমের বৈশিষ্ট্য এখানেই। এই প্রেম যত তদাভিমুখী হয় ততই বৃদ্ধি পায়, প্রগাঢ় হয়, অসীম হয় আর ভক্ত সেই প্রেম সমুদ্রে ডুবে যান।

তৎপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥

অন্বয় ঃ তৎ (সেই প্রেম) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হলে) তৎ এব (সেই প্রেমই কেবল) অবলোকয়তি (দর্শন করেন) তদেব (সেইটিই) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) তদেব ভাষয়তি (সেই বিষয়েই বলেন) তদেব চিন্তয়তি (একমাত্র তাই-ই চিন্তা করেন)।

অর্থ ঃ সেই পরাভক্তি যিনি লাভ করেছেন তিনি কেবল সেই প্রেমই দর্শন করেন, সেই প্রেমের কথাই শ্রবণ করেন, প্রেম

প্রসঙ্গেই কথা বলেন ও সেই সম্বন্ধেই চিন্তা করেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রেম সূক্ষ্মতম বস্তু থেকেও সূক্ষ্ম আর তাই তাকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তা সত্ত্বেও এটি যে একটি নিশ্চয়াত্মক অভিজ্ঞতা, স্বয়ং উপলব্ধ অনুভূতি সে কথা প্রকৃত ভক্তকে দর্শন করলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই আর সেই জন্যই এই পরাপ্রেমের ধারণাকে আমরা অলীক বলতে পারি না, অস্বীকার করতে পারি না। অন্যদিকে ঠিক এই অনুভূতি না হলেও যিনি ভক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেছেন তাঁর জীবনে কিন্তু এই অনুভূতি বারংবার ঘটে। এই জন্যই 'প্রতিক্ষণ বর্ধমানম্' এই বিশেষণটি ব্যবহার করা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে ভক্তের দ্বারা আর জগতের কাজ করা সম্ভব হয় না। এই সূত্রে তার কারণ বলছেন, এই পরাপ্রেম লাভ করলে ভক্ত সর্বত্রই সেই প্রেম অর্থাৎ প্রেমের পাত্রকেই দেখেন। এই দর্শন অর্থে কেবলমাত্র দর্শনেন্দ্রিয় নয় শ্রবণেন্দ্রিয়, বাগিন্দ্রিয়, মন সমস্তই সেই প্রেমাস্বাদনেই তখন বিভোর হয়ে থাকে। সর্বত্রই তিনি তাঁকে দেখেন, সর্বক্ষণই তাঁর বিষয়ে শ্রবণের জন্য উৎসুক থাকেন, তাঁর কথা ভিন্ন অন্য কথা বলেন না এবং একমাত্র তাঁরই চিন্তা করেন। মন তাঁরই চিন্তায় প্রতিমুহূর্তে ব্যাপ্ত থাকে। এইরকম যে অবস্থা তখন অন্য কোন কাজ করবার অবকাশই থাকতে পারে না।

অতএব এই প্রেমের স্বরূপ সীমিত ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য হলেও ভক্তকে দেখে আভাসে এর অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করি। জানি যে এটি একটি বিশেষ অনুভূতি যা তাঁকে সর্বচিন্তাবিনির্মুক্ত করে, তদ্গতচিত্ত করে। এই তদ্গত ভাবটি বোঝাবার জন্যই সূত্রকার বলেছেন, 'তদেবাবলোকয়তি'— 'তদেব শৃণোতি' ইত্যাদি।

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্তাদি ভেদাদ্ বা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয় ঃ গৌণী (বৈধী ভক্তি) ত্রিধা (তিন প্রকার) গুণভেদাৎ (ত্রিবিধ গুণের ভেদ হেতু) বা (অথবা) আর্তাদি ভেদাৎ (আর্ত প্রভৃতি ভেদ হেতু)।

অর্থ ঃ সত্ত্বাদি তিন গুণের প্রাধান্য অনুসারে অথবা তিনি কি প্রার্থনা করেন, কিসের থেকে মুক্তি চান সেই অনুসারে প্রবর্তক সাধককে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্বপূর্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭ ॥

অন্বয় ঃ উত্তরস্মাৎ উত্তরস্মাৎ (উত্তরোত্তর থেকে) পূর্বপূর্বা (পূর্ব পূর্ব প্রকারের) [ভক্তি] শ্রেয়ায় (অধিকতর কল্যাণকর) ভবতি (হয়)।

অর্থ ঃ পরবর্তী প্রকার থেকে পূর্ববর্তী ভক্তি শ্রেয়।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তিকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, পরাভক্তি—শ্রেষ্ঠভক্তি। দ্বিতীয়ত, বৈধীভক্তি—এটি গৌণী। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ এই তিনগুণের প্রাধান্য অনুসারে এই গৌণী ভক্তিকে আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। এগুলির মধ্যে সাত্ত্বিক ভক্তি সম্পূর্ণ নিষ্কাম—ঈশ্বরে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। এই ভক্তিতে ভক্তের নিজের জন্য কোন প্রার্থনা থাকে না। সেইজন্যই একে সাত্ত্বিকী ভক্তি বলে। রাজসিক ভক্তের মনোভাব—আমি তাঁকে ভালবাসি, তিনিও যেন আমাকে ভালবাসেন। এই ভক্তিতে একটা আদান-প্রদানের ভাব লক্ষিত হয়। তামসিকতার অর্থ নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় মনোভাব। তাই এই ভক্তিতে ভালবাসার কোন উচ্ছ্বাস

নেই। এ ভালবাসার গতি এতই ধীর যে মনে হয় যেন মন স্বপ্নলোকে বিচরণ করছে (যেন ভালবাসার স্বপ্ন দেখছে)। তার বোধে এই ভক্তির অনুভূতিই জাগ্রত নেই—এ নিছকই তামসিকতা। তামসিক ভক্ত নিজের সুখ ও আনন্দের জন্যই ব্যগ্র—ভালবাসার পাত্র সম্বন্ধে তার কোন ভাবনা নেই। এই অত্যন্ত স্বার্থবোধের জন্যই একে তামসী ভক্তি বলা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ আছে। "প্রকৃতি অনুসারে ভক্তি তিনরকম। ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ। ...ভক্তির তমঃ—যেমন ডাকাত পড়া ভক্তি। ডাকাত ঢেঁকি নিয়ে ডাকাতি করে, আটটা দারোগার ভয় নাই—মুখে 'মারো! লোটো!' উন্মাদের ন্যায় বলে—'হর, হর, হর, ব্যোম, ব্যোম! জয় কালী!' মনে খুব জোর, জ্বলন্ত বিশ্বাস।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৪৯৯-৫০০) ডাকাত যেমন সব লুট করে নেয় তমোগুণী ভক্তও তেমনি ভগবানের কাছে আদায় করে ছাড়ে। এইভাবে দেখা যায় যে প্রথম শ্রেণীর ভক্তি শুদ্ধা ও অহৈতুকী। দ্বিতীয়টিতে আছে দানের সঙ্গে প্রতিদান প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। আর তৃতীয়টিতে শুধুই পাওয়া, দেওয়া নয়। এই তিনগুণ অনুসারে যে শ্রেণীবিভাগ ভাগবতে কপিল-দেবহূতি সংবাদেও এর উল্লেখ আমরা পাই।

আবার আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী—এই তিন শ্রেণীর ভক্ত অনুসারে গৌণী ভক্তিকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। ভগবদ্গীতায় যে চার প্রকার ভক্তের উল্লেখ দেখি তার মধ্যে জ্ঞানী ভক্তকে নারদ গৌণী ভক্তির থেকে বাদ দিয়েছেন। এই তিন প্রকার ভক্তের মধ্যে পরেরটি থেকে পূর্বের জন মহৎ।

সেই দিক থেকে আর্ত ভক্ত তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। নারদের মতে আর্ত হচ্ছেন অসহায় ভক্ত, তাই তিনি ভগবানকে ডাকেন। তিনি ঈশ্বরের

কাছে ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি প্রার্থনা করেন। ভগবৎ রাজ্যে প্রবেশের এটাই রাজপথ। অপরদিকে জিজ্ঞাসু ভক্ত তিনিই, যাঁর শুধু তত্ত্ববস্তু জানারই আকাঙ্ক্ষা। ঈশ্বরকে ডাকবার ব্যাকুলতা তাঁর নেই। আর অর্থার্থী তার থেকেও নিচের ধাপের ভক্ত, কারণ তিনি কেবল নিজের বাসনাই চরিতার্থ করতে চান, ঈশ্বরকে তাঁর প্রয়োজন নেই।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়ঃ অন্যস্মাৎ (অন্যান্য পথ থেকে) ভক্তৌ (ভক্তি পথে) সৌলভ্যম্ (প্রাপ্তি সহজ)।

অর্থ ঃ অন্যান্য সাধনপথের তুলনায় ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ সহজে হয়।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান সূত্রটির বিশেষ মূল্য আছে। দেবর্ষি এখানে ঘোষণা করছেন যে জ্ঞান ও কর্ম থেকে ভক্তির আরাধনায় লক্ষ্য বস্তু অনেক সহজে পাওয়া যায়। পরবর্তী সূত্রে এই অনায়াস লভ্যতার কারণ দেখিয়েছেন।

প্রমাণান্তরস্য অনপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ চ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়ঃ প্রমাণান্তরস্য (অন্য কোন প্রমাণের) অনপেক্ষত্বাৎ (প্রয়োজন না থাকায়) চ (এবং) স্বয়ং (নিজেই) প্রমাণত্বাৎ (প্রমাণ এইজন্য) [সুলভতা]।

অর্থ ঃ ভক্তির আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। ভক্তি নিজেই প্রমাণ স্বরূপ।

ব্যাখ্যা ঃ অন্যান্য পথ থেকে ভক্তিপথে ভগবানকে সহজেই পাওয়া যায়, একথা আগেই বলেছেন। এই সূত্রে তার কারণ ব্যাখ্যা করছেন। বলছেন যে, ভক্তি অন্য কোন বিশেষ হেতু বা যুক্তি নিরপেক্ষ। ভক্তি নিজেই নিজের সাক্ষী। ভক্তির উদয় হলে তখন আর ভক্তের মনে এ প্রশ্ন ওঠে না, এ সংশয় জাগে না যে তাঁর এ ভালবাসা সত্যিই কি ভ্রান্তি! অন্য পথে কিন্তু সে আশঙ্কা থেকে যায় যে, এই যে আমার অনুভূতি এটা ঠিক তো? ধরা যাক কর্মযোগের কথা, তার মধ্য দিয়ে যে ফল লাভ হয়, সঙ্গে সঙ্গেই সংশয় জাগে এ দিয়ে কি কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ হবে? সেখানে কোন নিশ্চিত তথ্য আমাদের নেই। জ্ঞানযোগে আমরা সর্বক্ষণই বিচার করি। অর্থাৎ তা যুক্তি বিচারের গভীরতার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। এই জ্ঞান বিচার-যুক্তিজাল-সিদ্ধান্ত স্থাপন এসব যে পরম সত্যের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে তার কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ কোথায়? যুক্তি প্রমাণ থাকলে তা অবশ্য গ্রাহ্য, অন্যথা নয়। কিন্তু ভক্তি পথে ভক্ত সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। ভক্তি নিজেই এখানে নিজের প্রমাণ। অন্তরের গভীরতম উৎস থেকে এই অনুভূতির সত্যতা সম্পর্কে ভক্তের মনে কোন দ্বিধা দেখা দেয় না। ভক্তির উদয়েই ভক্তির প্রমাণ। অবশ্য এখানেও ভক্তিবাদী অন্যান্য পথ সম্বন্ধে বিশেষত জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে একটু অকারণ অপবাদ দিচ্ছেন বলা যায়। কারণ প্রকৃত জ্ঞানীর হৃদয়ে যখন জ্ঞান উন্মেষিত হয় তা সেই পরম জ্ঞানই, জ্ঞানীরও তখন সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়। অন্যদের সংশয় থাকতে পারে, তারা প্রশ্ন তুলতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীর তখন আর কোন জিজ্ঞাসা থাকে না।

ভক্তের ক্ষেত্রেও তেমনি অপরের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে প্রেমিক ভক্তের এই গভীর ঈশ্বর প্রেমের অনুভূতি কি সত্যই তাঁর পরম প্রাপ্তিকে সূচিত করছে? [যেমন জ্ঞানীর ক্ষেত্রে, তেমনি ভক্তের ক্ষেত্রেও অন্যদের পক্ষে এর উত্তর জানা সম্ভব নয়, তাঁরা প্রশ্ন করতেই পারেন।]

ভক্ত কিন্তু স্বয়ং অসংশয়িতাত্মা, তিনি জানেন তিনি লক্ষ্য বস্তু লাভ করেছেন।

এখন তিনি নিঃসংশয় হলেও, এ নিশ্চিত বিশ্বাস আত্মপ্রবঞ্চনাও তো হতে পারে? তিনি হয়তো নিজেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। এইখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে একটা ধারণা যদি কোনদিন কোন কারণেই ভেঙে না যায় তবে তাকে ভ্রান্তি বলা চলে না। বিভ্রান্তি তাকেই বলা চলে যখন অন্য কোন পরিস্থিতিতে তা দূর হয়ে যায়। যেমন দড়িকে সাপ ভাবা ভ্রান্ত ধারণা, কারণ দড়ির স্বরূপ জানার সঙ্গে সঙ্গেই সাপের ধারণা দূর হয়ে যায়। বিভ্রান্তির আবরণ এক সময় খসে পড়বেই। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হয়ে থাকা এই যে ভাবভক্তি এর রেশ কোনদিনই কোন সময়ে মিলিয়ে যায় না। আর সেইজন্যই ভক্তের এই চিরস্থায়ী ভাবকে মোহ বা মানসিক বিভ্রম বলা চলে না। এইজন্যই বলছেন, যে ভক্তি অন্য প্রমাণনিরপেক্ষ। ভক্ত নিশ্চিত জানেন যে অনুভূতির চরম অবস্থা তিনি লাভ করেছেন—তার জন্য অন্য কোন পরীক্ষা প্রমাণ তাঁর কাছে অবান্তর। জ্ঞানের অন্য কোন শাখার উপর এ ভক্তি নির্ভরশীল নয়, এ ভক্তি স্বয়ং-নির্ভর ও স্বয়ংসিদ্ধ।

শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০ ॥

অন্বয় ঃ শান্তিরূপাৎ (শান্তিস্বরূপ বলে) চ (এবং) পরমানন্দরূপাৎ (পরমানন্দস্বরূপ বলে) [ভক্তির সাধন সুলভ]।

অর্থ ঃ ভক্তির পথ শান্তিস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ বলে তার সাধন অন্যান্য সাধন থেকে সহজ।

ব্যাখ্যা ঃ আগের সূত্রে বলেছেন যে ভক্তি স্বয়ংই প্রমাণস্বরূপ বলে তার সাধনে কোন জটিলতা নেই। আর এখন বলছেন ভক্তির সহজসাধ্যতার আরও কারণ যে ভক্তি স্বয়ং শাশ্বত শান্তি ও পরমানন্দস্বরূপ।

এ প্রসঙ্গে এই পরম কথাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাগতিক কোন ব্যাপারে সার্থকতা লাভ করলে বা কোন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে তৃপ্তিতে আমরা আনন্দিত হই। কিন্তু সে আনন্দ পরমানন্দ নয়, দীর্ঘস্থায়ী নয়, আনন্দের কণিকামাত্র। ভক্তিতে যে পরমানন্দ [যে অপার শান্তি] তার তুলনায় অন্য কিছুতেই অধিকতর আনন্দ নেই। এমন সুচিরস্থায়িত্ব নেই অন্য কোন জাগতিক সুখ শান্তিতে। এ আনন্দ সর্বোত্তম এবং নিজের অনুভূতির বিষয় বলেই এখানে অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা নেই। তাই এই ভক্তির সহজতা।

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্যা নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

অন্বয় ঃ নিবেদিতাত্মলোকবেদশীলত্বাৎ (নিজেকে, জগতের সব কিছু বস্তুকে এবং শাস্ত্রীয় আচারাদি সব কিছু ভগবানে নিবেদন করার ফলে) [ভক্তের পক্ষে] লোকহানৌ (লোকনিন্দায়) চিন্তা ন কার্যা (চিন্তা করা অকর্তব্য)।

অর্থ ঃ ভক্ত জাগতিক সর্ববস্তু ও শাস্ত্রীয় আচারাদি ত্যাগ করে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করেছেন বলে লোকনিন্দা সম্বন্ধেও তাঁর কোন চিন্তা করা উচিত নয়।

ব্যাখ্যা ঃ ঈপ্সিত বস্তু লাভ হলো কি না বা সুখের হানি হলো কি না—এ-সব বিষয়ে ঈশ্বরভক্তের কোন উদ্বেগ থাকা উচিত নয়। তিনি

শাস্ত্রনির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ ত্যাগ করেছেন, সতরাং তজ্জনিত যে সুখভোগ তা তাঁর থাকবে না এই ভাবনায় যেন তিনি বিন্দুমাত্র আশঙ্কিত না হন। কেন না তিনি যে নিজেকে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করেছেন, ত্যাগ করেছেন সুখৈষণা লোকৈষণা। বৈদিক যাগযজ্ঞে স্বর্গসুখ বা অন্য কোন পারত্রিক সুখ সম্ভব, কিন্তু সে সুখে তো তাঁর প্রয়োজনই নেই, কেন না তিনি তো ঈশ্বরে সমর্পিতপ্রাণ। এ বিষয়ে আরও একটি বিশেষ দিক হলো বৈধ অনুষ্ঠানাদি পালন না করার জন্য লোকে তাঁর সম্বন্ধে যে অভিমতই পোষণ করুক তাতে এই তদ্‌গতপ্রাণ ভক্তের যে কোন চিত্তবিক্ষোভ ঘটার অবকাশ নেই—কারণ লোকনিন্দায় তার কিছু যায় আসে না। যেহেতু ঈশ্বরে তিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করেছেন, তাই লোকনিন্দার এবং বৈদিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের সর্বপ্রকার ভয় থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবেন।

ন তৎ সিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু
ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্যমেব ॥ ৬২ ॥

অন্বয় ঃ তৎ (তাহা) সিদ্ধৌ (সিদ্ধির জন্য) লোকব্যবহারঃ (লৌকিক আচার ব্যবহার) ন হেয়ঃ (পরিত্যাজ্য নয়) কিন্তু ফলত্যাগঃ (পরন্তু কর্মফলত্যাগ) চ (এবং) তৎ সাধনম্ (তার জন্য প্রচেষ্টা) কার্যম্ এব (অবশ্য কর্তব্য)।

অর্থ ঃ ভক্তিপথে সিদ্ধিলাভ করার জন্য ভক্ত অপরের সঙ্গে সদাচার থেকে বিরত থাকবেন যে তা নয়, তবে কর্মফল ত্যাগ এবং কর্মফল ত্যাগের জন্য সে সাধন প্রয়োজন তা অবশ্যই অবলম্বন করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বসূত্রে বলা হয়েছে যে ভক্তের লোকাপেক্ষা বা শাস্ত্রাপেক্ষা থাকবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তবে কি তিনি যথেচ্ছাচার করতে পারেন? পারেন নিজের খেয়াল খুশি মতো চলতে? কেমন হবে তাঁর আচরণ?

এই সূত্রটি আগের সূত্রেরই সংযোজনা। বলা হচ্ছে ভক্তিপথে সিদ্ধির জন্য লৌকিক যথাযথ ব্যবহার পরিহার করার প্রয়োজন নেই। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সমস্ত কর্মই ঈশ্বরে সমর্পণ।

সর্বপ্রথম যা ত্যাগ করতে হবে তা হলো ফলাকাঙ্ক্ষা। একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। সুতরাং আর দশজনে যেমন কর্মরত থাকেন, তাকেও তেমনি কোন না কোন কর্ম করতেই হয়। কিন্তু সমস্ত কর্মের মধ্যে যেন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে লক্ষ্যের প্রতি। যে মহৎ লক্ষ্যে তিনি উপনীত হয়েছেন বা হওয়ার সাধনা করছেন, সেই লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে তাঁর সমস্ত আচার এবং আচরণ।

মূলগত ভাব হচ্ছে যে, যে কাজই তিনি করুন, তা যেন কেবল তাঁর নিজের কোন প্রাপ্তি বা নিজের কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই না হয়। তিনি কাঠ-পাথরের মতো জড় হয়ে থাকবেন না, কর্তব্যকর্ম অবশ্যই করবেন, কিন্তু তাতে ফলের আশা ও প্রাপ্তির অপেক্ষা রাখবেন না—এইটাই সব থেকে বড় কথা। কর্ম ত্যাগ নয়, কর্মফল ত্যাগ। কাজ করবেন, কিন্তু করবেন অনাসক্ত চিত্তে।

গীতায় ভগবান স্বয়ং বলছেন, 'ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।' (৩।৫) কোন কর্ম না করে থাকা জাত ব্যক্তির পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও অসম্ভব। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও কর্ম, আর তা বন্ধ করা চলে না। তাহলে তো জীবনই থাকবে না। সুতরাং সর্বকর্ম ত্যাগের কথা কোন

অবস্থাতেই বলা যায় না। কর্মফলে স্পৃহা থাকবে না বা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হবে না—এটাই দেখার বিষয়। এমন কি যেসব শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞ, যা যথাযথ করতে পারলে বিশেষ ফলোদয় হয়, ভক্ত তা-ও করতে পারেন, যদি সেই ফললাভে আন্তরিক কোন আকাঙ্ক্ষা সত্যিই না থাকে। গীতায় এই কথাই বলছেন —

'সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্ ॥' (৩।২৫)

অর্থাৎ, কর্মফলে আসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা যেমন কর্ম করে, আসক্তি বর্জন করে বিদ্বান ব্যক্তিও লোককল্যাণের জন্য সে রকম কর্ম করে থাকেন। লোককল্যাণের বাসনায় কেন করেন—না, তাহলে লোককল্যাণ তো একটা বাসনা-ই হলো না কি? হ্যাঁ, বাসনা, কিন্তু তা নিঃস্বার্থ—এটাই প্রভেদ। তিনি নিজের কিছু লাভের আশায় কর্ম করেননি। তিনি যথাশাস্ত্র সমস্ত কর্ম সম্পাদন করবেন কিন্তু কোন স্বার্থের প্ররোচনা সেখানে নেই বলে ফলভোগ তাঁকে করতে হয় না। কিন্তু সব কর্মেরই তো একটা ফল থাকে, কর্ম তো বন্ধ্যা হয় না। তাহলে সেই কর্মফল ভোগ করবে কে? ভোগ করবেন অন্যেরা।

শাস্ত্রমতে এই সব মহাপুরুষের যাঁরা সেবক, তাঁরাই তাঁর পুণ্যফলের অধিকারি হন। আর যেসব ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধাচারী ও তাঁর প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হন, তাঁরা তাঁর অসৎ কর্মকৃত ফলসমূহ ভোগ করেন। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দ্বারা অসৎকর্ম কি সম্ভব? এর উত্তরে বলা যায় যে, নিজেদের অজ্ঞাতসারে এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক অন্যায় ঘটে থাকে। সাধারণ কথা, চলতে ফিরতে আহারের সময় কত প্রাণীই তো আমাদের দ্বারা বিনষ্ট হয়। সেই অন্যায়ের প্রতিফল কাকে আশ্রয় করবে? তাঁর বিরোধী তাঁর

অনিষ্টকামী ব্যক্তিই সেই ফলভোগ করবে; এই হলো শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

অতএব কর্মত্যাগ নয়, স্বার্থযুক্ত কর্মত্যাগ, এই-ই মূল বক্তব্য। আর শুধু তাই নয়, যা আমাদের পরাভক্তি লাভের সহায়ক হয় সাধনকালে সেগুলি যেমন অবশ্য করণীয়, সিদ্ধিলাভের পরও তা অনেক সময় করতে হয়। করতে হয় দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য যাতে তাঁকে অনুসরণ করে অন্যরাও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

এই সিদ্ধ সাধকদের অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই সাধন ভজন তাঁদের এমন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, এমন স্বভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে যে সিদ্ধিলাভের পরও তাঁরা তা না করে পারেন না। এ সাধনের আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না কারণ তাঁরা তো সেই পরাভক্তি লাভ করেইছেন। তবুও সাধন সুখের অভ্যাসবশতই তাঁরা আগের মতই সব কিছু করেন।

স্ত্রী-ধন-নাস্তিক-[বৈরি-]চরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ স্ত্রী (নারী) ধন (অর্থসম্পদ) নাস্তিক (ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী) বৈরি (শত্রু) চরিত্রম্ (বৃত্তান্ত) ন শ্রবণীয়ম্ (শ্রবণ করা উচিত নয়)।

অর্থঃ নারী, ধনসম্পত্তি, নাস্তিক ব্যক্তি বা শত্রুসম্বন্ধীয় কোন আলোচনা শোনা উচিত নয়।

ব্যাখ্যাঃ পরাভক্তি লাভের বিঘ্নস্বরূপ কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলি অবশ্য পরিত্যাজ্য। এখানে দেবর্ষি সেইগুলিই উল্লেখ করে বলছেন যে, নারী বা অর্থাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ, ঈশ্বরে বিশ্বাসী নয়, এমন ব্যক্তির বা নিজের বিরুদ্ধপক্ষীয় কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন আলোচনা ভক্ত শ্রবণ করবেন না।

প্রথমেই বলেছেন স্ত্রীলোককে পরিত্যাগ করার কথা। স্বভাবতই এযুগে একথায় আপত্তি উঠবে। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ অন্য। এখানে নারীকে নারী বলে পরিহার করার কথা বলেননি। বলেছেন নারীসাহচর্যে যে কামভাব জাগতে পারে তাই পরিহার করার কথা। অর্থাৎ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে সাধকের সেই মনোভাব তৈরি করতে হবে যেন তাঁর চিত্তে তা বিক্ষোভ সৃষ্টি না করে, কামভাব উদ্রেক না করে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয় যে এ নির্দেশ যেমন পুরুষের ক্ষেত্রেও তেমনি নারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কামভাবের উদ্দীপনার সম্ভাবনা থাকলে যিনি ভক্তসাধিকা তিনিও পুরুষের সাহচর্য করবেন না। অর্থাৎ এই সাবধান বাণী স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মূলকথা কামভাব যাতে না আসে সে বিষয়ে এখানে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ সাধনপথের প্রথম বিঘ্ন কাম।

দ্বিতীয়ত, কাঞ্চন। ধনসম্পদের ভাবনা ক্রমশই মানুষকে তাতে আসক্ত করে তোলে। আবার যে ঈশ্বরবিশ্বাসী নয় তার সম্বন্ধে যদি আলোচনা করা হয় তবে তার জীবন, তার কথাবার্তা, আচারব্যবহার সাধককে প্রভাবিত করে ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলতে পারে। বিরোধী ব্যক্তি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। তার প্রসঙ্গ বারবার উঠলে মনে ক্রোধের সঞ্চার হবার সম্ভাবনা। সেইজন্যই এইসব বিষয় ও ব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা সাধকের শ্রবণ করা উচিত নয়।

এই নিষেধাবলীর গূঢ় অর্থ এই যে, যে বিষয়ই মনকে ঈশ্বরভাবনা থেকে সরিয়ে আনে, মনকে বিক্ষিপ্ত করে, ঈশ্বরের অনুধ্যানে বিঘ্ন ঘটায় তা সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এইসব বিষয়ে যদি সামান্যও প্রশ্রয় দেওয়া হয় তা ভক্তকে ঈশ্বরসান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। আর শুধু তাই

নয়, এ প্রশ্রয় সাধকের মনেও আসক্তি জাগিয়ে তুলবে।

গীতায় বলা হয়েছে, 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' (২।৬২)। বিষয়চিন্তা করতে করতেই আসক্তি আসে। সঙ্গ বা সংস্রব বড় বিপজ্জনক। প্রথমে লোকের মনে হয় কোন সংস্রবের দ্বারা সে প্রভাবিত হবে না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে [প্রকৃতপক্ষে] তা হয় না। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হয়। কেন না প্রথম দিকে এর অনিষ্টকারিতা বোঝা যায় না। লোকে ভাবে যে সে এর উপরে থাকতে পারে। কিন্তু সঙ্গ প্রভাবে তার মন ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। মন ক্রমশ ঈশ্বর থেকে সরে বিষয়সুখে আসক্ত হয়ে পড়ে, সেইজন্যই এখানে এই সাবধানবাণী। এই কঠোর সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন যা আধ্যাত্মিক পথের সাধকের অবশ্য অবধেয়। আপাতদৃষ্টিতে বিশেষত আধুনিক সমাজে এই অনুশাসন পালন করা অতি কঠিন, অসম্ভব এমনকি অবাস্তব মনে হতে পারে। সে আজকের সমাজ যাই বলুক না কেন, সমকালের মতামতকে অগ্রাহ্য করে সাধককে এই আদর্শ অনুসরণ না করলে চলবেই না।

আজকের দিনে অবাধ মেলামেশা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর কিছুদূর পর্যন্ত তা অনুমোদনও করা চলে। কিন্তু তা কতদূর পর্যন্ত, কোথায় থামা দরকার সে সম্বন্ধে একটা সীমারেখা স্পষ্ট থাকা দরকার। এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুবই মনে রাখা দরকার, কারণ এ আদর্শ সর্বসাধারণের জন্য নয়। যাঁরা ভগবৎচিন্তা করেন, যাঁরা সেই পরাভক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন এ আদর্শ তাঁদেরই জন্য। সাধারণ লোক এ মনোভাবের যতই নিন্দা করুক সাধকের পক্ষে এ সাবধানতা অতি জরুরী। কারও মতে এটা হয়তো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অবদমন, কিন্তু তা ঠিক কথা নয়। কেন না 'অবদমন' বলতে কি বোঝায়? প্রত্যেক নাগরিকেরই স্ব স্ব মনের উপর

সংযম থাকবে। সভ্য সমাজে এটা নিশ্চয়ই আশা করা হয়। কিন্তু যার যেমন ইচ্ছা যথেচ্ছাচার করলে তা আর মনুষ্য সমাজ থাকে না, পশু সমাজ হয়ে ওঠে। সুতরাং সংযমের অভ্যাস অপরিহার্য। সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেই যখন একথা সত্য তখন দৈবপ্রেমের ক্ষেত্রে আর কি বলার আছে। যে কোন সমাজেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত রাখতে হলে সংযমের শিক্ষা একান্ত আবশ্যিক।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদরা এই 'অবদমন' কথাটিকে কেন্দ্র করে এক বিরাট সোরগোল তুলেছেন। সর্বত্রই শুনি, 'আহা এ রকম ব্যবহারে একজনের ভাবনাগুলি অবদমিত হয়। ফলে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয় ও শেষপর্যন্ত স্নায়বিক বিপর্যয় দেখা দেয়।' ভাল কথা। যদি আমরা এটা মেনেও নিই আর আমাদের মনোবৃত্তিকে যথেচ্ছাচার (যথেচ্ছ কাজ) করতে দিই, তবে কি সেটা আদৌ মনুষ্য সমাজের যোগ্য হবে? লাগাম ছাড়া মন যদি যা চায় তাই করতে থাকে, তবে আর সমাজব্যবস্থাই টিকবে না, পশুসমাজ হয়ে উঠবে। পশু নিজেকে সংযত করতে পারে না এবং তাৎক্ষণিক প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করে। এই-ই তার পশুত্ব, আর তার উপরে সে উঠতেও পারে না। কিন্তু মানুষের সমাজ আর পশু সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইন্দ্রিয়ের উপর সংযমই মানব সমাজের ভিত্তি। তা না থাকলে এ পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়। সেইজন্যই কেউ যদি চূড়ান্ত অসংযমী হয় তার উপরে সমাজের শাস্তি নেমে আসে।

সুতরাং এই সামাজিক সুস্থতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই কি এই সংযম-শিক্ষার প্রয়োজন নেই? এই সংযমের গণ্ডি কতদূর সেটা আলাদা প্রশ্ন। সর্ববিষয়ে কিছুটা সীমা থাকা দরকার, তবে সে সংযমের পরিণাম কল্যাণকর হলে তার আর সীমা পরিসীমা থাকে না। অনেকে অবশ্য

বলেন যে, যে কোন সংযম শিক্ষাই কিছুদূর পর্যন্ত চলতে পারে, তার বাইরে গেলে নানা জটিলতার উদ্ভব হয়। কথাটা আংশিক সত্য, আংশিক ভুল। 'দমিত করা' শব্দটির অর্থ—তোমার কোন বিষয়ে একটা তীব্র প্রবৃত্তি আছে কিন্তু সেই প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজ করা থেকে তুমি নিজেকে নিবৃত্ত করছ অথচ সেই নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টার, সেই সংযমের পিছনে কোন উচ্চ আদর্শ নেই। কিন্তু যদি কোন ভয়ে বা চাপে বাধ্য না হয়ে একটা বিশেষ লক্ষ্যকে সামনে রেখে—যে লক্ষ্যের সঙ্গে চারিত্রিক শুচিতার একটা নিগূঢ় সম্বন্ধ ও অর্থ আছে—আমরা নিজেদের প্রবৃত্তিকে সংযত করি, তাতে কোন জটিলতা আসতে পারে না।

এরই নাম উত্তরণ, দিব্য রূপান্তর। ইন্দ্রিয় দমন নয়, তার দিব্যায়ন। দুটির লক্ষ্য ভিন্ন, তাই পরিভাষাও ভিন্ন। প্রথমটির মূলে কাজ করে লোকভীতি, দ্বিতীয়টিকে অনুপ্রেরিত (উৎসাহিত) করে এক মহৎ আদর্শ। তাই দুটির পরিণামও স্বতন্ত্র।

এ বিষয়ে এত কথা বলার কারণ যে আজ সমাজ অনেক পরিবর্তিত হচ্ছে। আগের তুলনায় সামাজিক বিধিনিষেধ অনেক শিথিল হয়েছে। নিজেদের সংসার ভেঙে যাচ্ছে অথচ লোকে তাকে অগ্রগতির চিহ্ন বলে ভাবছে। পশ্চিমী দেশগুলিতে যাঁরা অনেক ঘুরেছেন তাঁরা জানেন যে এই ইন্দ্রিয় সংযমের অভাব ও সহজাত প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ না করার ফলে সে দেশের সমাজ আজ কি অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এতে না আসছে স্থায়ী শান্তি, না সমাজের বন্ধনমুক্তি, না কোন উন্নত পরিবেশ।

মনে রাখতে হবে যে, সংযম অত্যাবশ্যক, কিন্তু তা লোকভয়প্রসূত হবে না। সংযমের মূলে যদি আদর্শপ্রীতি থাকে তবে তা অবদমনের কারণ হয় না। কোন উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহকে

প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের দিব্যভাবে রূপায়িত করার নামই উত্তরণ। পরে দেখা যাবে যে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয় ঃ অভিমান (অহঙ্কার) দম্ভ (গর্ব) আদিকং (প্রভৃতি) ত্যাজ্যম্ (ত্যাগ করা কর্তব্য)।

অর্থ ঃ অহঙ্কার, দম্ভ প্রভৃতি হীন মনোভাব ত্যাগ করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা ঃ সাধকের অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা ইত্যাদি অসৎ মনোবৃত্তিসমূহ ত্যাগ করা প্রয়োজন। অহঙ্কার, অভিমান ত্যাগ না করলে কিছু হবে না। অহঙ্কারের লেশমাত্র থাকলেও ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। অন্যান্য জগদগুরুদের মতো শ্রীরামকৃষ্ণও বলতেন, ভক্ত হতে হলে দীন হতে হবে। দাম্ভিক হলে, অহঙ্কারী হলে চলবে না। হতে হবে বিনয়ী, নম্র। ভগবদভিমুখী যাত্রাপথে যা কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তা ত্যাগ করতে হবে— এই-ই হলো মূল কথা।

কোন্ ধরনের মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া সঙ্গত নয়, তা অপরের বলে দেওয়ার দরকার হয় না। নিজেই বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়। যেমন সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা। এখন এটা যে কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা নয়। আমরা যখন একা থাকি তখন বহু সময় নিজের কাছে নিজেই মিথ্যাভাষণ করি, কপটতা করি। কিন্তু তা ঠিক নয়। নিজের কাছেও নিজেকে খাঁটি থাকতে হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিরপেক্ষ হয়ে সকলেরই সত্যপালনের অভ্যাস করতে হয়। কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিই হোন, সাধু বা গৃহী যা-ই হোন, সত্যে অবিচলিত থাকা প্রত্যেকেরই

ধর্ম। অপরকে প্রবঞ্চিত করা বা যা নই অপরের কাছে নিজেকে তা-ই বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করলে চলবে না। 'মন মুখ এক হবে'— শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তি মনে রাখা প্রয়োজন। অর্থাৎ মনে যা ভাববে তা লুকিয়ে না রেখে সত্য কথা বলবে।

তবে সত্যরক্ষা করতে গিয়ে কি অপরের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করব? নিষ্ঠুর হব? না, তা নয়। এখানে শঠতা করতে নিষেধ করা হচ্ছে। ব্যবহারে যেন কোন ছলচাতুরী, কপটতা না থাকে, এইটি বোঝবার। এখানে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়নি। স্ব স্ব ক্ষেত্রে কার কি কর্তব্য তা তাকেই বুঝে নিতে হবে। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে যা হানিকর তা ত্যাগ করতে হবে। এ তো হলো নিষেধের দিক। কিন্তু বিধিসম্মত কি করণীয় হবে তা বলা হয়েছে পরবর্তী সূত্রে।

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয় ঃ তদর্পিতাখিলাচারঃ (তাঁর উদ্দেশ্যেই সমস্ত কর্মের সমর্পণকারী) সন্ (হয়ে) কাম-ক্রোধ-অভিমানাদিকম্ (কাম, ক্রোধ, অভিমান প্রভৃতি) তস্মিন্ এব (তাঁর উপরই) করণীয়ম্ (করতে হবে)।

অর্থ ঃ সমস্ত কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে তাঁর উপরই কাম-ক্রোধ-অভিমান যা কিছু করবে।

ব্যাখ্যা ঃ ভগবানের প্রীতির জন্য যাবতীয় কর্ম করা এবং সমস্ত কর্ম তাঁকেই সমর্পণ করা ভক্তের কর্তব্য। কাম-ক্রোধ-অভিমান ইত্যাদি যেসব চিত্তবৃত্তি ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে সেগুলির মোড় ঘুরিয়ে

তাঁরই দিকে চালিত করতে হবে। যদি আমাদের কারও সঙ্গ অভিলাষ হয় তখন তাকে ভগবৎসঙ্গের ইচ্ছায় পরিবর্তিত করব। যদি কারও প্রতি ক্রুদ্ধ হই তবে সে ক্রোধের পাত্র করব নিজেকেই। পরমবস্তু পরাভক্তি লাভের জন্য আমাদের সাধনার এই মন্দ গতির জন্য নিজের উপরই ক্রুদ্ধ হব। আর অহঙ্কার যদি আসে পরমেশ্বরের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের গর্বে গর্বিত হব।

এই বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণেরও অভিমত—আমি ঈশ্বরের দাস, আমি তাঁরই অংশ—এ অভিমান ভাল। এতে সাহায্যই হয়, ক্ষতি হয় না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে এই হীন মনোবৃত্তিগুলিকে ঊর্ধ্বায়িত করতে হবে। কাম-ক্রোধাদি যা আমাদের ঈশ্বর-বিমুখ করতে পারত তা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দিব্য প্রভাবের কারণ হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, এসব অন্যপথে চালিত কর, ভগবানের দিকে মোড় ঘুরিয়ে দাও। বিপথগামী না করে লক্ষ্যস্থানে (গন্তব্যে) পৌঁছতে সাহায্য করবে। তাঁর কথায়, তুমি যদি তামসিক ভাবকেও আধ্যাত্মিক পথে ঘোরাতে পার তবে তার জোরেও তুমি ভগবানকে লাভ করবে।

এ যে অবদমন করা নয় ঊর্ধ্বায়ন—যে কথা প্রথমেই বলেছিলাম সেই ভাবটিই এখানে প্রকাশিত। সেই দিব্যসত্তার সঙ্গেই আমাদের সব কিছু যুক্ত থাকা দরকার। আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কর্মভাবনা সমস্তই হবে তাঁকে কেন্দ্র করে। তখন আর জোর করে কোন আবেগকে নিরুদ্ধ করে রাখা ও তার ফলে মনোজগতে নানা জট সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে না। সব কিছুই ঈশ্বরাভিমুখী করে তুলতে পারব তখন এই সুসংযত আবেগের সাহায্যেই আমাদের অধ্যাত্মপথের যাত্রা হবে অনুকূল-নির্বাধ-নিরঙ্কুশ।

মনোবৃত্তিসমূহকে অন্য পথে পরিচালিত করার জন্য এই যে আমরা কিছু উদাহরণ দিলাম—এর ভাবটিই মূল কথা এবং সেই ভাবটি নিয়ে সাধকমাত্রেরই ভাবনা করা দরকার। উদাহরণগুলি আক্ষরিক অর্থে নেবার দরকার নেই, আবার প্রচলিত ভাবের পরিপন্থী বলে অগ্রাহ্যও যেন না করা হয়। সাধকের প্রয়োজন নিজের জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে এর সত্যাসত্য পরীক্ষা করা। এই রিপুসমূহের দিব্যায়ন—এটা অনেকের কাছে নতুন ঠেকতে পারে, কিন্তু শত শত বৎসর ধরে এইভাবে সাধনা করা হয়েছে ও সে সাধনা ফলবতীও হয়েছে।

ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকং নিত্যদাস-নিত্যকান্তাত্মকং বা প্রেম এব কার্যং প্রেম এব কার্যম্ ইতি ॥ ৬৬ ॥

অন্বয় ঃ ত্রিরূপভঙ্গপূর্বকম্ (এই তিন প্রকার গৌণী ভক্তিকে অতিক্রম করে) নিত্যদাস নিত্যকান্তাত্মকম্ (সর্বদা দাসভাবে অথবা কান্তাভাবে) প্রেম কার্যম্ (ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে) প্রেম এব কার্যম্ (একমাত্র তাঁকেই ভালবাসতে হবে)।

অর্থ ঃ গৌণী ভক্তির যে তিনটি বিভাগ তা অতিক্রম করে ঈশ্বরকে দাস্যভাবে বা পত্নীভাবে নিরন্তর সেবা করবে এবং একমাত্র তাঁরই প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণ রাখবে।

ব্যাখ্যা ঃ কি করণীয় এবং কি অকরণীয় সে কথা আগের সূত্র দুটিতে বলার পর নারদ এখানে বলছেন যে, এই প্রেমের পাত্র একমাত্র ঈশ্বরই। আমাদের সমস্ত প্রেম একমাত্র তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত। একমাত্র

এটি বোঝাবার জন্য পুনরুক্তি করা হয়েছে। এখানে অনুশাসনের অবশ্যকর্তব্যতা যেমন নিরূপণ করা হয়েছে তেমনি তার আগে কি ত্যাগ করে আসতে হবে সেটাও বলেছেন। ইতঃপূর্বে ৫৬নং সূত্রে যেমন সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ভক্তির কথা ও আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী—তিন রকমের ভক্তের কথা বলেছেন, সেই অবস্থাগুলি অতিক্রম করে আসা চাই। আমরা জেনেছি যে এই তিন ক্ষেত্রেই পরেরটি থেকে আগেরটি শ্রেয়। কিন্তু সেই শ্রেয় অবস্থাও অতিক্রম করে তবে এই প্রেমের সাধনা। কি এই সাধনা? নারদ বলেছেন—ভৃত্য যেমন প্রভুর সেবা করে বা সতী স্ত্রী যেমন পতিকে সেবা করেন তেমনি ভগবানকে একনিষ্ঠভাবে নিরন্তর সেবা করতে হবে। কিছু কিছু বাধা আসতে পারে, কিন্তু ভক্তের সেবায় যেন ছেদ না ঘটে, তা যেন অবিচলিত ও অবিচ্ছিন্ন হয়। এরই নাম প্রেম, ভগবানের প্রতি সত্যকারের ভালবাসা। 'প্রেম এব কার্যম্' কথাটি দুবার উল্লেখ করে নারদ এই প্রেম সাধনের মাহাত্ম্য বোঝাতে চেয়েছেন।

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়ঃ ভক্তাঃ (সাধকগণ) একান্তিনঃ (একাভিমুখী নিষ্ঠাযুক্ত) মুখ্যাঃ (প্রধান)।

অর্থঃ ঈশ্বরের প্রতি যাঁদের ঐকান্তিক ভালবাসা আছে তাঁরাই প্রথম শ্রেণীর ভক্ত।

ব্যাখ্যাঃ ঈশ্বরকে যাঁরা ঈশ্বর বলেই ভালবাসেন, ঈশ্বরের প্রতি যাঁদের অখণ্ড একনিষ্ঠ প্রেম তাঁরাই প্রধান ভক্ত। এখানে 'প্রধান' শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এই প্রেমের দুটি শর্ত ঃ প্রথমত—একাগ্রতা; দ্বিতীয়ত—

একনিষ্ঠতা। অনেক ভালবাসার বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরও একজন, তা নয়। সেটি একনিষ্ঠ প্রেম হলো না। মন ঈশ্বরে, একমাত্র ঈশ্বরেই লীন থাকবে। সেই তন্ময়তায় দ্বিতীয় ব্যক্তি বা বিষয়ের কোন স্থান নেই।

এখন এ কথার অর্থ কি এই যে অন্য সবাইয়ের সম্বন্ধে ভক্ত উদাসীন হবেন? না, তা নয়। তাদের মধ্যেও তিনি ভগবানকেই দর্শন করেন সেই হিসাবে তাঁরাও তার প্রিয়। তিনি কোন ব্যক্তিকেই বিশেষ ব্যক্তি বলে ভালবাসেন না, ভালবাসেন কারণ তাঁর মধ্যে ঈশ্বরই বিরাজিত। সুতরাং তিনি যে উদাসীন থাকবেন তা নয়। তাঁর প্রেম হবে একাগ্র, এইটিই বলার। এ প্রেমের অন্য কেউ অংশীদার থাকবে না। বাইবেলে আছে, 'I am jealous God', আমি ঈর্যাপরায়ণ ঈশ্বর। অর্থাৎ তিনি চান না তাঁর প্রেমের কেউ ভাগীদার থাকে—ভক্তের ভালবাসা বহুধা বিভক্ত হয়। তিনি হৃদয়ের সবটুকুই অধিকার করতে চান, নতুবা একটুও নয়। আমাদের প্রীতির কিছু অংশ তাঁকে দিলাম বাকিটা রেখে দিলাম জগতের অন্যদের জন্য, তাতে তিনি সন্তুষ্ট নন। প্রকৃত ভক্তের কাছে এমন ভাব আশা করা যায় না। তিনি একমাত্র ঈশ্বরাভিমুখী হবেন।

দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসা। তাঁর কাছে ভগবান অন্য কোন বস্তুপ্রাপ্তির হেতু নন। তাঁর কাছে ঈশ্বর স্বয়ংই সাধ্যবস্তু। তিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন ঈশ্বর বলেই, অন্য কোন কারণে নয়। তিনি তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এ জন্য নয়। তাঁর ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ—একমাত্র তাঁরই প্রীত্যর্থে। সুখ বা শান্তির আশাও তিনি করেন না। তাতেও জড়িত থাকে স্বার্থবোধ। স্বার্থচিন্তার লেশমাত্র ভাবনা এখানে থাকে না। অতি নিগূঢ় কোন উদ্দেশ্যও যেখানে থাকে না, তাই-ই হলো শুদ্ধপ্রেম। আর সে প্রেম ঈশ্বরকে, একমাত্র ঈশ্বরকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত।

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং
লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ ॥ ৬৮ ॥

অন্বয় ঃ কণ্ঠাবরোধ (বাক্‌রোধ) রোমাঞ্চ (শিহরণ) অশ্রুভিঃ (অশ্রুবিসর্জনযুক্ত) পরস্পরং (পরস্পরের সঙ্গে) লপমানাঃ (আলোচনায় নিযুক্ত থেকে) কুলানি (নিজেদের বংশ) পৃথিবীং চ (এবং পৃথিবীকে) পাবয়ন্তি (পবিত্র করে থাকেন)।

অর্থ ঃ এই সব ভক্ত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ও রোমাঞ্চিত শরীরে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে পরস্পরের সঙ্গে আলাপে রত থেকে নিজের বংশকে এবং পৃথিবীকে পবিত্র করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এখানে এইসব ভক্তদের আচরণ কেমন সে বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এঁরা নিজেদের ভক্তির বিষয়ে বা ভগবৎ প্রসঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করেন। সেই সময়ে তাঁদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রেমানুভূতির আতিশয্যে তাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব হয় না। মন যতই ঈশ্বরের প্রতি মগ্ন হয় ততই কথা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই অর্থেই বলেছেন যে বাক্‌রোধ হয়ে যায়। তীব্র ভক্তির বেগে (আবেগে) তাঁদের মাথার চুল সোজা হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, সারা দেহে রোমাঞ্চ হয়। লৌকিক ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, যে কোন তীব্র আবেগে এ ধরনের শারীরিক পরিবর্তন ঘটে, চুল খাড়া হয়ে যায়। অশ্রুপাতও এই প্রেমাবেগের আর একটি প্রকাশ।

এ যা বলা হলো, সবই ভক্তির বহিরঙ্গ প্রকাশ। মনে রাখা দরকার যে এসব ভক্তের পূর্ব-অভ্যাসজনিত নয়, সবই হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। অন্যক্ষেত্রে কি হয়? দক্ষ পেশাদার অভিনেতারা যেমন করেন তেমনি

একটা উদ্দীপনের কারণ উপস্থিত করে লোকে সেই বিষয়ের আবেগকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে ও সেই আবেগের ফলস্বরূপ অশ্রু, পুলক ইত্যাদি দেখা দেয়। যখন ঐ সব অভিনেতারা নিজেদের এই আবেগকে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, তখনই বাইরের উদ্দীপনার প্রয়োজন হয়। সুদক্ষ অভিনেতার পক্ষে বাইরের উদ্দীপনা ব্যতীতও অশ্রুপাতাদি সম্ভব। কিন্তু এ হলো নিছকই কৃত্রিম অভিব্যক্তি। ভক্তের চোখে কিন্তু আপনিই জল আসে, তিনি ইচ্ছা করে ক্রন্দন করেন না বা তেমন ভাব প্রকাশের কথা তাঁর মনেও ওঠে না।

এছাড়া প্রেমের আরও লক্ষণ আছে যথা স্বেদ বা ঘর্ম, শারীরিক কম্পন ইত্যাদি। তা মহাভাবের বিকার। কিন্তু এ ব্যাপারে ভক্তকে সাবধান হতে হয়। লোক দেখানোর জন্য যেন তিনি এসব অভ্যাস না করেন। প্রকৃত প্রেমভক্তির সঙ্গে তাহলে তাঁর কোন সম্বন্ধ থাকবে না।

একবার এমনি এক ব্যাপার ঘটেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ একবার দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের একজন শিষ্য নির্জনে বসে শ্রীরামকৃষ্ণের যেসব লক্ষণ দেখা দিত, সেই সব আয়ত্ত করার চেষ্টা করছেন। এই ভুল পথ অনুসরণ করা দেখে স্বামীজী তাঁকে খুব তিরস্কার করলেন। বললেন, 'এসব তার অভ্যাস করার বিষয় নয়। ভক্তি ভালবাসার সাধনা কর। তখন এসব আপনিই আসবে। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে যে এইসব ভাবের প্রকাশ ঘটত সে যে তিনি চাইতেন বলে নয়। তিনি এসব বাইরের প্রকাশ চাইতেন না, কিন্তু ভাবের আতিশয্যে এইসব ফুটে বেরত।' সুতরাং সাধু সাবধান থাকবেন, এগুলি নিতান্ত বাইরের লক্ষণ এবং সর্বদা অভ্রান্তও নয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মধ্যে বিবিধভাবের প্রকাশ দেখে যেন আমরা ভেবে না নিই যে তিনি একজন বড় ভক্ত। তিনি তা না-ও হতে পারেন। আবার ভক্তির চরম অবস্থায়, এসব লক্ষণ ভক্তের অঙ্গে স্বতই প্রকাশ পায়, এ-ও সত্য।

ভক্তেরা পরস্পরের সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গ করতে ভালবাসেন। কেন না যখনই কোন লোকের মনে কোন আবেগের প্রাবল্য আসে সে সম-অনুভূতিসম্পন্ন অন্যদের সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করতে চায়, সে তাতে আনন্দ পায়। এ নয় যে ভক্ত অন্যদের কাছে নিজেকে জাহির করতে চান। একাকী বসে ঈশ্বর চিন্তা করুন অথবা অন্যদের সঙ্গে ঈশ্বর প্রসঙ্গ করুন, সমস্ত মন তখন ঈশ্বরেতেই মগ্ন থাকে বলে অশ্রু-কম্প-রোমাঞ্চ প্রভৃতি ভাবের প্রকাশ তাঁর শরীরে দেখা যায়।

এইসব ভক্ত যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেই পরিবারকে এবং জগৎকেও ধন্য করেন, পবিত্র করেন। তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তি এতই প্রবল যে সমস্ত পরিবারই তাঁর প্রভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আর শুধু পরিবার নয়, এরকম মহৎ ভক্তের আর্বিভাবে বিশ্বজগৎও পবিত্র হয়।

তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি
সচ্ছাস্ত্রী কুর্বন্তি শাস্ত্রাণি ॥ ৬৯ ॥

অন্বয় ঃ তীর্থানি (তীর্থসমূহকে) তীর্থী কুর্বন্তি (পবিত্র করেন) কর্মাণি (সমস্ত কর্মসমূহকে) সুকর্মী কুর্বন্তি (শুভ কর্মে পরিণত করেন) শাস্ত্রাণি (শাস্ত্রসমূহকে) সচ্ছাস্ত্রী কুর্বন্তি (সৎ শাস্ত্রে পরিণত করেন)।

অর্থ ঃ প্রকৃত ভক্তেরা তীর্থ স্থানগুলি পবিত্র করেন, সমস্ত কর্মকেই মঙ্গলময় করেন এবং শাস্ত্রগুলিকে সৎ শাস্ত্রে পরিণত করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তের হৃদয়ে যখন প্রেমের সঞ্চার হয় তখন সেই প্রেমিক ভক্তের সংস্পর্শযুক্ত স্থান পবিত্র হয়, এমনকি তীর্থস্থানগুলির

মাহাত্ম্য আরও বর্ধিত হয়। ভগবদ্ভক্তের উপস্থিতিতে যেসব স্থান ধন্য হয়েছে, পবিত্র হয়েছে তাকেই আমরা তীর্থ বলি। যে কোন তীর্থস্থানই এইরকম মহান ভক্তের স্মৃতিবিরাজিত। যে দেশেই তাঁরা বাস করেন সে দেশ পবিত্র হয়, তীর্থ রূপে গণ্য হয়, ভগবদ্ভক্তের এমনই মহিমা। সাধারণ মানুষ সেই পবিত্রতার কণামাত্রও যদি মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে, পবিত্র হতে পারে এই আশায় তীর্থে যায়। [আর ভক্ত যখন কোন তীর্থে যান পুণ্য স্থানের মাহাত্ম্য তিনি নূতন করে প্রকটিত করেন, পূর্বতন স্থানের মাহাত্ম্য তাঁর সংস্পর্শে আরও বৃদ্ধি পায়।] আবার ভক্ত যে কর্মেরই অনুষ্ঠান করেন সে সবই হয় সৎ ও শোভন। তাতে থাকে মঙ্গলের স্পর্শ।

তাঁরা শাস্ত্রাদির পরিমার্জন করে সেগুলিকে সৎ শাস্ত্রে পরিণত করেন। শাস্ত্রে ভাল-মন্দ একত্রে মিশে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, "শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৫৫৯) এই মহৎ ব্যক্তিরা যখন শাস্ত্র অনুসরণ করেন তাঁরা ভালটুকুই বেছে নেন ও মহাজন অনুসৃত বিধি-শাস্ত্রের ভেজাল অংশটুকু বাদ দিয়ে তাকে শুদ্ধ-শাস্ত্রে পরিণত করেন। মহৎ ব্যক্তিরা শাস্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখান বলেই শাস্ত্রকে আমরা পবিত্র বলে মানি। আবার ভক্তদের দ্বারাই শাস্ত্রের পবিত্রতা রক্ষিত হয়। তাঁরা শাস্ত্রের জীবন্ত ভাষ্যরূপ। তাঁরা না এলে শাস্ত্রই অর্থহীন হয়ে পড়ত।

তাই সূত্রের নিষ্কর্ষ এই যে, ভক্তেরা যে স্থানে বাস করেন, সেই স্থানে তাঁদের মাহাত্ম্যের প্রভাব থেকে যায়। তাঁরা যে কাজই করুন, তাঁদের পূত সংস্পর্শে সে কাজ হয় কল্যাণময়। আর শাস্ত্রকে সম্মান দিয়ে তাঁরা শাস্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁরা শাস্ত্র প্রাধান্য না মানলে, শাস্ত্রকে গৌরব

দান না করলে শাস্ত্র বন্ধ্যা হয়ে থাকত। এইসব সাধক ও সাধিকারা নিজেদের জীবনে শাস্ত্রবাক্যকে মূর্ত করে তুলেছেন। শাস্ত্রের সত্যতা প্রমাণ করেছেন বলেই শাস্ত্রের প্রাধান্য।

তন্ময়াঃ ॥ ৭০ ॥

অন্বয় ঃ তৎ (তাঁতেই—ঈশ্বরেই) ময়াঃ (গত হয়ে আছেন)।

অর্থ ঃ এই প্রেমিক ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরেই তদ্গত।

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ
সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয় ঃ পিতরঃ (পূর্বপুরুষগণ) মোদন্তে (আনন্দ করেন) দেবতাঃ (দেবগণ) নৃত্যন্তি (নৃত্য করেন) চ (এবং) ইয়ং (এই) ভূঃ (জননী পৃথিবী) সনাথা (নাথযুক্তা) ভবতি (হন)।

অর্থ ঃ [এইরকম ভক্তের আবির্ভাবে] পূর্বপুরুষেরা আনন্দিত হন, দেবতারা আনন্দে নৃত্য করেন এবং জননী ধরিত্রী একজন রক্ষাকর্তা লাভ করেন।

নাস্তি তেষু জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-ধন-
ক্রিয়াদি-ভেদঃ ॥ ৭২ ॥

অন্বয় ঃ তেষু (এই ভক্তদের মধ্যে) জাতি (বর্ণাশ্রম) বিদ্যা (পাণ্ডিত্য)

রূপ (সৌন্দর্য) কুল (বংশ) ধন (অর্থসম্পদ) ক্রিয়া (জীবিকা) আদি (প্রভৃতির) ভেদঃ (বৈষম্য) নাস্তি (নাই)।

অর্থ ঃ প্রেমী ভক্তরা অপরের জাতি-বিদ্যা-রূপ-কুল-অর্থাদি বা জীবিকাজনিত ব্যাপারে মনে কোন ভেদবুদ্ধি রাখেন না।

যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩ ॥

অন্বয় ঃ যতঃ (যেহেতু) তদীয়াঃ (সব কিছু তাঁরই)।

অর্থ ঃ (ভেদবুদ্ধি থাকে না) কারণ এ জগতের যা কিছু সবই যে ঈশ্বরের নিজেরই।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূত্র কটিতে দেবর্ষি ভক্তের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এর আগে বলেছেন যে, তাঁরা যে স্থানে বাস করেন সে স্থান পবিত্র হয়। তাঁদের সমস্ত কৃতকর্ম শুভকর এবং শাস্ত্রও তাঁদেরই অনুবর্তনের ফলে পবিত্র হয়। পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের প্রভাবে দেশ-কর্ম-গ্রন্থ সবই পূত-পবিত্র হয়।

সেই একই সুরে নারদ বলেছেন যে, এমন মহান পুরুষ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন পিতৃলোকবাসীরা উৎফুল্ল হন, দেবতারা সানন্দে নৃত্য করেন, পৃথিবী শান্তি লাভ করে। পূর্বপুরুষেরা এই ভেবে আনন্দ লাভ করেন যে তাঁদের বংশে একজন মহাপুরুষের (মহাত্মার) জন্ম হয়েছে। পৃথিবী থেকে অশুভ শক্তির অবসান ঘটবে এই ভেবে দেবতাদের আনন্দ, আর জগৎবাসীর জন্য একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব ঘটেছে এই ভেবে ধরিত্রীর আনন্দ।

এই ভক্তদের মনে জাতিবর্ণগত, বিদ্যা ও কৃষ্টিগত, রূপসৌন্দর্য বা ঐশ্বর্যগত এবং জীবিকাগত কোন ভেদবুদ্ধি নেই। কোন্ ভক্ত কি করেন বা কোথায় তাঁর জন্ম, এসব তাঁর চিন্তাতেও আসে না। পরাপ্রেমের আস্বাদ লাভ করে ঐহিক রূপ-গুণ তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। ধনী না দরিদ্র, বিদ্বান না মূর্খ, উচ্চকুলজাত না অন্ত্যজ এসব বিচারের ঊর্ধ্বে তাঁর স্থিতি। এই বৈষম্যবোধ এই দ্বন্দ্ব থেকে দূরে সব কিছুর থেকে নিরপেক্ষ হয়ে একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগই তাঁর চিত্তকে অধিকার করে রাখে। তাঁরা সবাই তাঁর সন্তান, ঈশ্বরের আপনজন সুতরাং লৌকিক মাপকাঠির এই বৈষম্য তাঁদের মধ্যে কোন ভেদ আনতে পারে না। এক দিব্য অনুভূতির অস্তিত্ব তাঁদের ব্যক্ত করে রেখেছে, তাই তার কোন্ বংশে জন্ম, কি তার জাতি এ সবই তাদের কাছে অবান্তর। সর্বত্র সর্বদা তাঁর সেই দিব্য সত্তার উপস্থিতিই শুধু অনুভব করেন।

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয় ঃ বাদঃ (তর্ক) ন অবলম্ব্যঃ (অবলম্বন করা উচিত নয়)।

অর্থ ঃ ভক্ত বৃথা তর্ক করবেন না।

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ চ ॥ ৭৫ ॥

অন্বয় ঃ বাহুল্য অবকাশত্বাৎ (বহুবিধ মতের সম্ভাবনা হেতু) চ (এবং) অনিয়তত্বাৎ (কোন মতেই স্থির সিদ্ধান্তের অসম্ভাব্যতা হেতু) [তর্ক করবে না]।

অর্থ ঃ [যে কোন বিষয়ে তর্কে] নানা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন

মতের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু কোনটির দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, [সেইজন্য ভক্তের পক্ষে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত নয়]।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্ত যেন অকারণ তর্কে প্রবৃত্ত না হন সেই বিষয়ে এখানে সতর্ক করা হয়েছে। ঈশ্বরের বিষয় বা অন্য কোন আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা ভক্তদের মধ্যে কে বড় কে ছোট এইসব বিষয় নিয়ে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়। এই ধরনের সমালোচনা সাধককে মূল সত্য থেকে, পরাভক্তি থেকে দূরে সরিয়ে আনে। বৃথা যুক্তিতর্কে প্রবেশ না করে ভক্তিভাবটি মনের মধ্যে সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। যতদূর সম্ভব বেশি করে সেই ভাবটি আমরা লাভ করবার চেষ্টা করব, সরে থাকব তাত্ত্বিক যুক্তিতর্ক ও বিচার থেকে, সাধকের এটাই কর্তব্য। বিভিন্ন মত নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় মত্ত হলে লক্ষ্য বস্তুকে হৃদয়ে ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। তাঁর সম্বন্ধে এক নিরন্তর ভাব-প্রবাহ আমাদের প্রভাবিত করে, অযথা বাক্যব্যয়ে সেই প্রবাহ ব্যাহত হয়। তাই ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য এই সব দার্শনিক বিবাদ বিসম্বাদ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা দরকার।

যখনই আমরা কোন বিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হই আমাদের একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থাকে আর আমরা যুক্তি দিয়ে বিচার করে বোঝাতে চাই যে আমার মতই ঠিক। আর এর ফলে আমাদের মন সেই সত্যকারের ভক্তিভাব থেকে সরে আসে। সেইজন্যই এই বিষয় থেকে এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধকদের সম্বন্ধে কোন তুলনামূলক আলোচনা থেকে সরে থাকা প্রয়োজন। 'অমুক ভক্ত অমুকের থেকে ভাল' ইত্যাদি মনোভাব অন্যায়। এই ধরনের ভাবনায় মন লিপ্ত হলে ঈশ্বরীয় ভাব গ্রহণের যোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়।

'তর্ক করবে না' এই ছোট্ট সতর্ক বাণীর তাৎপর্য অনেক। আলোচনা একেবারে যে করা হবে না তা নয়, কিন্তু তা পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্যই নয়, আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান কত গভীর এটা বোঝাবার জন্যও নয়। সে আলোচনার মূল লক্ষ্য হবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে ভক্তিভাবটি আরও দৃঢ় করে তোলা। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি জাহির করা সাধকের ভাব নয়।

যখন কোন মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করি, তখন এই ভক্তিভাব ও ঈশ্বরীয় অনুপ্রেরণা তাঁর থেকে গ্রহণ করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। বিভিন্ন মতের আলোচনা বা অন্যান্য মহাপুরুষদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তুলনার প্রচেষ্টা যেন না থাকে। এইসব বিচার মানুষকে কূট সমালোচক করে কিন্তু সূক্ষ্ম অনুভূতি থেকে দূরে সরিয়ে আনে। সেইজন্য ভগবদ্ভক্তের সম্বন্ধে বা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিতর্কে যেতে নিষেধ করছেন। তর্কের খাতিরে না হয় ধরলাম যে একজন নাস্তিককে আমি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে বোঝাবার প্রয়াস করব। কিন্তু কি হবে তাতে? নিজের অজান্তেই তার মতবাদ আমার উপর কিছু ছাপ ফেলবেই।

তাই দেখা যায় যে এই ধরনের আলোচনা শুধু যে অপ্রয়োজনীয় তাই নয়, এর একটা ক্ষতিকারক দিকও আছে। এর ফলে আমাদের মনে সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই আমরা সন্দিগ্ধমনা হয়ে উঠি। গোড়ায় ভাবি যে যুক্তির দ্বারা অন্যদেরই আমরা স্বমতে আনব, কিন্তু অনেক সময়ই তা হয় না। পরিবর্তে আমাদেরই মনে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভক্তি-রাজ্যে কোন সংশয়ের স্থান নেই। সাধক সমস্ত সংশয়ের অতীত হয়ে সমগ্র মনপ্রাণ দিয়ে ভক্তিভাবে তন্ময় থাকবেন।

এই অমূল্য উপদেশ সর্বক্ষণই মনে রাখা প্রয়োজন। অবান্তর আলোচনায় প্রবেশ করে নিজেদের মনে তাতে অবিশ্বাসের বীজ বপন করা হয়। আমাদের মনের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়, বিশেষত মহাপুরুষদের সান্নিধ্যে। তাঁদের সঙ্গ অতি দুর্লভ। বেশির ভাগ সময়েই তা পাওয়া যায় না। সুতরাং যখন তা পাই তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে যতটা পারি তাঁদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা এবং মহৎ ভাবসমূহ গ্রহণ করার প্রয়াস যেন আমাদের থাকে।

এতক্ষণ যা বলা হলো তা সাধকের দিক থেকে। তবে যাঁরা মুখ্যভক্তি লাভ করেছেন তাঁদেরও কিন্তু এই যুক্তি-তর্কে জড়ানো সঙ্গত নয়। কারণ অন্যের যুক্তিতে সাধকের তাঁর নিজের পথ ও লক্ষ্য সম্পর্কে সংশয় হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এমন দৃষ্টান্ত দেখেছি। যখন অন্য কেউ তাঁর বিশ্বাস, তাঁর উপলব্ধির বিষয়ে তর্ক তুলেছেন, তিনি জগন্মাতার কাছে তা নিরসনের জন্য ছুটে গেছেন। যদিও মজা দেখার জন্য কখনও দু-একজনকে বিচারে উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি এই তার্কিক মনোভাবের (মনোবৃত্তির) বিরোধী ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন "বৃথা তর্ক-বিচার করলে বস্তুলাভ হয় না।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ৫০১)—এ তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত। বিচারের দ্বারা বস্তু সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা হতে পারে, নতুন নতুন ভাবের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে সত্য, কিন্তু ঝোঁকের মাথায় বিচারের মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার সম্ভাবনাও থাকে এবং কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এই তর্ক বিচারের দ্বারা কোন শেষ এবং সত্য সিদ্ধান্তে যে পৌঁছনো যায়—এ বিষয়ে নিশ্চিত সম্ভাবনা তো নেই-ই বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ আলোচনা

নিষ্ফলই হয়। সেইজন্যই সর্বতোভাবে এই তর্কস্পৃহা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে আমরা কোন যুক্তিকেই গ্রাহ্য করব না। শ্রদ্ধাভাজন উপযুক্ত (যোগ্য) ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করব না। নিজেদের চিন্তাভাবনাকে স্বচ্ছতর করার জন্য এই শ্রবণ-মননের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, যা প্রায়ই হয়ে থাকে তা হলো, এই সব আলোচনা দীর্ঘ-প্রসারী হয় কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ফলদায়ক হয় না। এর দ্বারা মনের উন্নতি সাধন হয় না, ভক্তি বিশ্বাস সুদৃঢ় হয় না, বরং মনকে বিক্ষিপ্ত করে। সেইজন্যই এই সাবধান বাণী।

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বর্ধক-কর্মাণ্যাপি করণীয়ানি ॥ ৭৬ ॥

অন্বয় ঃ ভক্তিশাস্ত্রাণি (ভক্তি-বিষয়ক শাস্ত্রাদি) মননীয়ানি (মনন করতে হয়) তৎ বর্ধক-কর্মাণি (যে সকল কর্মের দ্বারা ভক্তি বৃদ্ধি পায় সেই সকল কর্ম) করণীয়ানি (অনুষ্ঠান করা উচিত)।

অর্থ ঃ ভক্তি-বিষয়ক শাস্ত্র পাঠ করা এবং তা নিয়ে মনন করা ও যেসব কর্মের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন হয় সেই সব কর্মের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন।

ব্যাখ্যা ঃ এই সূত্রে যে সমস্ত গ্রন্থে ভক্তি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই সব গ্রন্থের অধ্যয়ন ও গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা ও চিন্তা করার কথা

বলেছেন। আলোচনার অর্থ শুষ্ক তর্ক নয় এবং গ্রন্থ বলতেও সব ধরনের গ্রন্থ নয়, কেবলমাত্র ভক্তিবিষয়ক শাস্ত্র গ্রন্থ। ভক্তিমার্গের অনুসরণকারী বিশেষভাবে জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে যেন আলোচনা না করেন বা ঐ বিষয়ের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন না করেন। সেক্ষেত্রে ভক্তের ভুলপথে পরিচালিত হওয়ার বা বিভ্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেসব গ্রন্থে ভগবানের প্রতি ভক্তি ভালবাসার কথা বলা হয়েছে সেই সব গ্রন্থই ভক্তরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন, নিজে তা নিয়ে ভাববেন এবং যেসব সাধনের বা আধ্যাত্মিক ক্রিয়া-কর্মের মধ্য দিয়ে ভক্তিভাব জাগে সেই সব কর্ম অভ্যাস করবেন। ভক্তির উদ্দীপনা হয় এমন সমস্ত অনুষ্ঠানই বিধেয়।

অর্থাৎ বিচার আলোচনা প্রভৃতি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা নয়, অবান্তর ব্যর্থ আলোচনা পরিহার করে ভক্তিগ্রন্থাদির বিষয়বস্তু সম্যকভাবে বোঝার জন্য ফলপ্রসূ আলোচনা করার কথা বলছেন। কর্ম সম্বন্ধেও একই কথা। যে কাজ ভক্তিলাভের সহায়ক সেই সমস্ত কাজ করণীয়, বৃথা কাজ নয়।

আমরা সবাই জানি শ্রীরামকৃষ্ণও ধর্মগ্রন্থ পড়তে উৎসাহ দিতেন। ভাগবত গ্রন্থ ও চৈতন্যদেবের জীবনী পাঠের উপদেশ তিনি প্রায়ই দিতেন।

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে ক্ষণার্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অন্বয়ঃ সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-লাভাদি-ত্যক্ত (সুখ-দুঃখ-ইচ্ছা-লাভ প্রভৃতি ত্যাগ হওয়ার জন্য) কালে (সময়ে) প্রতীক্ষমাণে (পাওয়া গেলে) ক্ষণার্ধম অপি (মুহূর্ত মাত্রও) ব্যর্থং (বৃথা) ন নেয়ম্ (অতিবাহিত করবে না)।

অর্থ ঃ সুখ, দুঃখ, বাসনা, লাভক্ষতি ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে ভক্তের অবকাশ এখন বেশি। তিনি অর্ধ মুহূর্ত সময়ও যেন নষ্ট না করেন।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তকে সর্বচিন্তাবিনির্মুক্ত হতে হবে এ কথা আগেই বলেছেন। তাঁর মনে সুখ দুঃখ লাভ বা বাসনা কিছুই এখন না থাকায় তিনি সমস্ত ভাবনামুক্ত। এখন অন্য চিন্তা না থাকায় এই যে শূন্য মন এটি দিয়ে তিনি কি করবেন? বৃথা সময় কাটিয়ে দেবেন? সময়ের অনেক মূল্য, সুতরাং অন্য কোন কাজের অবকাশে যদি আধ মুহূর্ত সময়ও পাওয়া যায় তবে ভক্তিলাভের জন্য তার সফল উপযোগ করতে হবে, নষ্ট হতে দেওয়া চলবে না।

আর সুখদুঃখাদি সমস্ত দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে আসায় ভক্তের এখন দীর্ঘ সময়। কিভাবে ভক্তি আরও বাড়ে সেই দিকেই এই সময়টা নিয়োজিত করা। লৌকিক বাসনাযুক্ত কর্মত্যাগ করার অর্থ নিশ্চিত আলস্যে সময় কাটানো নয়। বরং এখন আরও কঠিন কাজ। প্রতিমুহূর্তে সচেতন থাকা যেন সমস্ত সময়টাই ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যে সার্থকভাবে যাপিত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের সাধকমাত্রেই এই বিষয়ে অবহিত থাকবেন। আর কোন উচ্চাশা না থাকায় এবং লোকসঙ্গ ত্যাগ করার ফলে অন্যের তুলনায় সাধকের হাতে সময় প্রচুর। কিন্তু প্রায়ই যা ঘটে, এই সময়টার যথাযথ সদ্ব্যবহার হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতি বা ভক্তিলাভের অনুকূল প্রচেষ্টায় সাধক যথেষ্ট যত্নের সঙ্গে লেগে থাকেন না। সেইজন্যই সূত্রকার সাবধান করে বলছেন ধর্মাচরণের নাম করে যেন অলসতাকে প্রশ্রয় না

দিই। ক্ষণার্ধও বৃথা না যায় অর্থাৎ সর্বদা সচেতন থাকা যে অন্য চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে যেন ভগবানের প্রতি ভক্তিলাভের জন্য আন্তরিক চেষ্টা করি।

অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদি-চারিত্র্যাণি পরিপালনীয়ানি ॥ ৭৮ ॥

অন্বয় ঃ অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়া-আস্তিক্য (অহিংসা, সত্য, শুচিতা, দয়া, ঈশ্বরে বিশ্বাস) আদি (প্রভৃতি) চারিত্র্যাণি (চারিত্রিক গুণসমূহ) পরিপালনীয়ানি (পালন করা কর্তব্য)।

অর্থ ঃ অহিংসা, শুচিতা, দয়া, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি গুণগুলি ভক্ত আয়ত্ত করবেন ও তার আরও বিকাশ সাধন করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ সাধক ভক্তের অহিংসা, সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা, শুদ্ধচারিতা, দয়া, ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রভৃতি সৎধর্ম চর্চা করা ও পালন করা কর্তব্য। ভগবৎ-প্রীতি লাভের জন্যই এই গুণগুলির অনুশীলন প্রয়োজন। এর আগে তাঁর যে অবকাশের কথা বলা হয়েছে সেই অবকাশের মুহূর্তগুলিতে এই গুণসমূহের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তিনি নিজেকে নিযুক্ত করবেন। গুণগুলির প্রত্যেকটিই মনোযোগের দাবি রাখে।

প্রথমত অহিংসা। এর অর্থ কায়মনোবাক্যে অপরের ক্ষতিসাধন না করা। অপরের ক্ষতি করার ভাবনাও মনে উঠবে না, ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কাজ করবে না বা অপরের মনে পীড়াদায়ক কথাও বলবে না। অর্থাৎ চিন্তা, কর্ম ও বাক্য তিনটি ক্ষেত্রেই অহিংসার অনুশীলন করতে

হবে। অহিংসার অভ্যাসের অর্থ অপরের ক্ষতিসাধন করার পরিবর্তে তাকে সর্বদা সাহায্য করা। ধর্মজীবনে চলতে গিয়ে আমরা অনেক সময় খেয়াল না রেখে অপরের ক্ষতি সাধন করে ফেলি। যেমন কোন কোন সময় খুব ধার্মিক ব্যক্তি (সাধুরাও) হয়তো যাঁরা তাঁদের মতাবলম্বী নন তাঁদের উদ্দেশে কোন কটু মন্তব্য করে ফেলেন কিংবা নাস্তিক ব্যক্তিদের নিন্দা করেন। ভক্তের পক্ষে এ কাজ ঠিক নয়। কাজে-কথায়-চিন্তায় কোনভাবেই অপরকে দুঃখ দেওয়া থেকে তাঁকে নিবৃত্ত থাকতে হবে। এটি নিষেধাত্মক আচরণের কথা।

এর বিপরীতে যা করতে হবে সেটি অহিংসার ইতিমূলক দিক। ভক্ত সর্বদাই অপরকে সাহায্য করবেন, অপরকে ভালবাসবেন। অপরে যাতে সুখী হয় সেই চেষ্টা করবেন। অবশ্য সুখী করবার বিনিময়ে নিজে যেন ভগবানের পথ থেকে সরে না আসেন সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। অপরকে সাহায্য করার অর্থ এই নয় যে তিনি ঈশ্বরোপলব্ধির যে লক্ষ্য তা বিস্মৃত হবেন বা পরাভক্তি লাভের পথ থেকে বিচ্যুত হবেন। ঈশ্বরের স্থান সর্বাগ্রে। তাঁর আসনে অন্য কারও স্থান নেই।

অপরকে সাহায্য করার নামে পরার্থপরতা যেন মনে নেশার মতো না হয়ে ওঠে। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাপ্তিই শুধু ক্ষীণ হবে না, অপরের সহায়ক হিসেবেও তেমন সফল হতে পারব না। নিজে যতক্ষণ না শুদ্ধ হই, ততক্ষণ কিভাবে অপরকে প্রকৃত সাহায্য করা যায় তা আমরা বুঝতে পারি না। ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হয়ে সাহায্য করায় প্রকৃত উপকার হয় না। বরং সেই সময় ঈশ্বরকে ভুলে থাকার জন্য সে উপকারের ভাবমূল্যটাই নষ্ট হয়। সেইজন্য এমনকি জগদ্ধিতকর ধ্যান

ধারণার অনুশীলন ও প্রয়োগের সময়েও যেন আমাদের আধ্যাত্মিক প্রগতি অটুট থাকে।

সত্যপথে চলা আর একটি বিশেষ চারিত্রিক গুণ। যিনি ধর্মপথের পথিক, ঈশ্বরোপলব্ধি অথবা পরাভক্তি যাঁর লক্ষ্য, তাঁকে সর্বতোভাবে সত্যে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কায়-মন-বাক্যে তাঁর সত্যাচরণ প্রয়োজন। অসত্য ভাষণ না করা, যা সত্য নয় এমন চিন্তা না করা, যা সত্যনির্ভর নয় এমন কাজ না করা—এই তিনটিই সত্যধর্মের অন্তর্গত।

এরপর সদাচরণ (শৌচ) একটা খুব বড় কথা। এটি ধর্মজীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য অত্যাবশ্যক। এই ব্যাপারটায় আমরা প্রায়ই উদাসীন থাকি। ভাবি সাধারণে যেমন আচরণ করেন আমাদেরও তেমন করলেই হবে। কিন্তু এটি বুঝতে হবে যে, আমাদের যা লক্ষ্য তা লাভের জন্য এরকম সাধারণ আচরণ উপযোগী নয়।

যাঁরা ঈশ্বরবিশ্বাসী নন তর্কের খাতিরেও কিন্তু কখনও আমরা তাঁদের ধ্যানধারণা বা তাঁদের ভাব গ্রহণের কথা চিন্তাতেও আনব না। অবিশ্বাসীর ভানও যেন আমরা কখনও না করি। আস্তিক্য ধর্ম বলতে এই কথাই বোঝানো হয়েছে। কখনও কখনও লোকে বাহাদুরী দেখিয়ে বলে আমি ভগবান মানি না, যদিও তারা মানে এবং জানেও যে মানে। এ ঠিক নয়। এতে একই সঙ্গে সে সত্যভ্রষ্টও হলো আবার অপরের মনে এ ধারণাও সৃষ্টি করল যে সে বুঝি সত্যই নাস্তিক। এরকম লোক দেখানো ব্যবহার করে শেষপর্যন্ত তার নিজেরই ক্ষতি হয়। তাই এ ধরনের বাহাদুরী দেখানোর প্রলোভনকে, স্পর্ধিত মনোভাবকে সংযত করা দরকার।

সর্বদা সর্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবান্ এব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অন্বয় ঃ সর্বদা (সমস্ত সময়) সর্ব ভাবেন (সমস্ত প্রকারে) নিশ্চিন্তিতৈঃ (সব চিন্তা ও উদ্বেগমুক্ত ভক্তি দ্বারা) ভগবান এব (একমাত্র ভগবানই) ভজনীয়ঃ (সেব্য)।

অর্থ ঃ সব ভাবনাচিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ভক্ত সমস্ত সময় সর্বতোভাবে ভগবানেরই ভজনা করবেন।

ব্যাখ্যা ঃ আগের সূত্রে ভক্তের কয়েকটি ধর্ম বা গুণের কথা বলা হয়েছে। সেই গুণগুলির অনুশীলন করতে হবে। একমাত্র ঈশ্বরই সমস্ত সৎগুণের আধার। ভক্ত সব দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে উঠে, যাবতীয় উদ্বেগ থেকে নিজেকে মুক্ত করে, অন্য কোন বিষয়ে মন না দিয়ে সর্বদা সর্ব প্রকারে ভগবৎ ভজনায় রত থাকবেন। তাঁর সমস্ত মন সর্বদা আত্মসংস্থ থাকবে।

এখানে দুটি বিষয় আছে—মানসিক শান্তি ও ভগবৎমুখিনতা। সব রকম দুশ্চিন্তা থেকে, জাগতিক লক্ষ্যবস্তু অর্জনের উদ্বেগ থেকে, নিজের খ্যাতি সুনাম ইত্যাদি হারানোর আশঙ্কা থেকে, নিজের ধনসম্পদ-সম্পর্কিত বিষয়-চিন্তা থেকে মনকে যে মুক্ত রাখতে হবে, সেটা শুধুই একটা ধীর ও শান্ত মানসিকতা অর্জনের জন্য নয়, সেটার উদ্দেশ্য হলো ভক্তের মন যাতে বিনা বাধায় সর্বতোভাবে ঈশ্বরাভিমুখী হয়। সব রকম উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত অবস্থায়, ভক্ত একমাত্র ঈশ্বরের পূজা ও আরাধনাতেই নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন।

এই কথার তাৎপর্য এই যে ভক্তের নিজের আনন্দের জন্যই যে মানসিক শান্তি প্রয়োজন তা নয়। শান্তি পেলেও শান্তি লক্ষ্য নয়, এটা মনে রাখবার বিষয়। আমরা প্রায়ই বলি, বেশ শান্তিতে আছি। কিন্তু ভক্তের

তাতে কি? শান্তি একটা প্রাপ্তি বটে, কিন্তু নিম্ন স্তরের প্রাপ্তি। এ শান্তিতে কেউ হয়তো সুখী বা আনন্দিত, কিন্তু ভক্ত নন। ভক্তের লক্ষ্যবস্তু শান্তি নয়—ভগবান এবং একমাত্র ভগবান।

অতএব যা কিছু সাধনা তা মানসিক সুখ শান্তি বা খ্যাতির জন্য নয়, ভগবানকে ভজনা করার জন্যই পূর্বোক্ত সমস্ত গুণের অনুশীলন ও অভ্যাস। মনে অন্য কোন চিন্তার উদয় হবে না, অন্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির ভাবনাও জাগবে না।

কেউ কেউ একথা ভাবেন, যে আধ্যাত্মিক জীবন বেশ সুখের ও শান্তির জীবন। কিন্তু ভক্ত তা মনে করেন না। ভগবানে ভক্তি ভালবাসা না হওয়ার বেদনা যখন তাঁকে অসুখী করে, তাকেই তিনি তাঁর সম্পদ বলে মনে করেন। তিনি সুখ চান না, শান্তি চান না, চান একমাত্র তাঁকেই, ভগবানকেই। তাই তাঁর সেবাতেই সর্বক্ষণ মনকে নিয়োজিত রাখা, ভক্তিধর্মের অনুশীলন করাই ভক্তের লক্ষ্য; মানসিক সুখ শান্তি বা আনন্দ নয়।

স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি
অনুভাবয়তি চ ভক্তান্ ॥ ৮০ ॥

অন্বয় ঃ সঃ (ঈশ্বর) কীর্ত্যমানঃ (তাঁর মহিমা কীর্তন করলে) শীঘ্রম্ এব (অবশ্যই অতি দ্রুত) আবির্ভবতি (আবির্ভূত হন) চ (এবং) ভক্তান্ (ভক্তদের) অনুভাবয়তি (নিজের প্রকাশ অনুভব করান)।

অর্থ ঃ শুদ্ধ ভক্তরা যখন ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করেন, তখন তিনি অতি সত্বর নিজেকে প্রকাশ করেন ও ভক্তদের নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়ে কৃতার্থ করেন।

ব্যাখ্যা ঃ এই যে প্রায়ই আমরা ভক্তদের বলতেও শুনি—সুখে আছি, শান্তিতে আছি, যেন এটাই তার অভীষ্ট সিদ্ধি। তা কিন্তু নয়। সুখ শান্তি কিন্তু চরম লক্ষ্য নয়। এই নিরুদ্বিগ্নতার সার্থকতা এটাই যাতে তিনি ঈশ্বরে সম্পূর্ণ মন দিতে পারেন। অন্য কোন চিন্তায় ভগবৎচিন্তা ব্যাহত না হয়। আর তা না করে যদি সুখ শান্তিতেই পরিতৃপ্ত থেকে যাই তবে ভগবানে ভক্তির পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি বুঝতে হবে।

এইরকম ভ্রান্ত ধারণা মন থেকে উৎপাটিত করতে হবে। সর্বদা দুঃখবোধ থাকবে—এ আমার কথার অর্থ নয়। আমি বলতে চাইছি যে একমাত্র পরাভক্তি লাভ করলেই সত্যকারের সুখ। সাধারণ ঐহিক সুখ আমাদের কাম্য হতে পারে না, সে সুখ নশ্বর। ঈশ্বরই সর্বদা সর্বত্র সর্বাবস্থায় একমাত্র আরাধ্য। ঈশ্বরপ্রেমই একমাত্র অনুশীলনের বস্তু। সারাদিন আমরা যা করি সেইসব পান, আহার বা স্বাভাবিক দৈনন্দিন সাধারণ ক্রিয়াকর্ম যার সঙ্গে ধর্ম অধর্মের কোন সম্বন্ধ নেই, সে সমস্ত কাজের মধ্যেও ঈশ্বরকে যেন নিয়ত স্মরণ করি।

ভক্তের জীবনে এমন কিছুই থাকবে না, যা ঈশ্বর-চিন্তায় পরিব্যপ্ত নয়। সত্যকারের ভক্ত যিনি তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি কর্মে ঈশ্বরের স্মরণ মনন চলতেই থাকে। তাঁর প্রতিটি কর্মই ঈশ্বরের পূজা। ভক্তের সমগ্র জীবনই ঈশ্বরের পূজার মূর্ত প্রকাশ। জাগতিক সর্ববিষয়ে অবিচলিত অনন্যচিত্ত ভক্তের সমস্ত কর্মই ঈশ্বরের প্রীতি লাভের জন্য।

ভক্তের এই নিরন্তর উপাসনা ও স্তুতি মহিমাকীর্তনে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান স্বয়ং ভক্তের কাছে প্রকাশিত হন ও পরম অনুভূতি লাভের দ্বারা তাঁর জীবন ধন্য করেন। তখনই জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য প্রাপ্তি, ঈশ্বরোপলব্ধি ঘটে। তারপর অতি সত্বরই তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়।

ভক্তের এই-ই হলো ভগবৎপ্রাপ্তির পথ এবং তা-ও অতি স্বল্প সময়ে। অবশ্য ভক্তের ঐকান্তিকতা ও সাধনের তীব্রতার উপরই নির্ভর করে সিদ্ধিলাভের সময়। যখন তিনি সর্বক্ষণই তাঁর লীলা কীর্তন করেন, তাঁকে ধ্যান করেন, যিনি সর্বতোভাবে পবিত্র, যাঁর মনে ঈশ্বরচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা নেই, তাঁর ঈশ্বর লাভের আর বিলম্ব থাকে না।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥

অন্বয় ঃ ত্রিসত্যস্য (পরম সত্যের প্রতি) ভক্তিঃ এব (ভক্তিই একমাত্র) গরীয়সী (শ্রেষ্ঠ)।

অর্থ ঃ একমাত্র এই পরম সত্যের প্রতি ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।

ব্যাখ্যা ঃ বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ এই তিনকালে ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য সত্য। তিনি নিত্য বর্তমান, কোন সময়ই অসৎ নন, নিত্য সৎ ও অবিনশ্বর—এই-ই তার মহিমা। এই অনাদি অনন্ত ঈশ্বর ভক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বস্তু। এই শ্রেষ্ঠত্ব বোঝাবার জন্যই বাক্যাংশটি দুবার উচ্চারিত হয়েছে।

এতক্ষণ পরাভক্তি বা পরাপ্রেম লাভের বিবিধ উপায় বর্ণনা করা হলো। কি কি বিঘ্ন আসতে পারে এবং তা দূরীকরণের বিষয়ও আলোচিত হয়েছে, যাতে কোন বিপদ-বিচ্যুতি না ঘটে। যুগে যুগে যা একমাত্র পরম সত্যবস্তুরূপে কীর্তিত সেই পরম সত্যের প্রত্যক্ষ অনুভবের জন্য যেসব সাধনার কথা বলা হয়েছে ভক্ত সর্বক্ষণ তাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখবেন। সমস্ত আলোচনার সার হচ্ছে এই যে, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য বর্তমান, অক্ষয়-অব্যয়-জগতের অন্য সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী। ঈশ্বর তিনকালে একমাত্র সৎ তাই তিনিই একমাত্র আমাদের প্রেমের পাত্র।

গুণমাহাত্ম্যাসক্তি-রূপাসক্তি-পূজাসক্তি-স্মরণাসক্তি-দাস্যাসক্তি-সখ্যাসক্তি-কান্তাসক্তি-বাৎসল্যাসক্তি-আত্মনিবেদনাসক্তি-তন্ময়াসক্তি পরমবিরহাসক্তিরূপা একধা অপি একাদশধা ভবতি ॥ ৮২ ॥

অন্বয়ঃ [এই ভক্তি] একধা অপি (এক প্রকারের হলেও) গুণমাহাত্ম্যাসক্তি (ঈশ্বরের গুণকীর্তনের প্রতি অনুরাগ) রূপাসক্তি (তাঁর মনোহর রূপলাবণ্যের প্রতি আসক্তি) পূজাসক্তি (তাঁর পূজায় আনন্দ) স্মরণাসক্তি (তাঁকে স্মরণ-মনন করার ইচ্ছা) দাস্যাসক্তি (দাসরূপে ভালবাসা) সখ্যাসক্তি (তাঁকে সখারূপে পাবার ইচ্ছা) বাৎসল্যাসক্তি (সন্তানরূপে ভালবাসা) কান্তাসক্তি (স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভালবাসা) আত্মনিবেদনাসক্তি (তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করার বাসনা) তন্ময়াসক্তি (তদ্গত হয়ে যাবার আস্পৃহা) পরম বিরহাসক্তি (তাঁর বিরহজনিত দুঃখবোধের আকাঙ্ক্ষা) একাদশধা ভবতি (ইত্যাদি একাদশ প্রকারের হয়)।

অর্থ ঃ একই পরাভক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে একাদশ রূপে প্রকাশিত হয়।

১. ঈশ্বরের মাহাত্ম্যসূচক বিভিন্ন গুণের বর্ণনায় (তাঁর লীলামাহাত্ম্য তাঁর বিচিত্র গুণসমূহের স্মরণ, মনন ও আলোচনায়) ঐকান্তিক আগ্রহ।

২. তাঁর অসামান্য রূপলাবণ্যের প্রতি অনুরাগ।

৩. তাঁর সেবা ও পূজায় আসক্তি।

৪. তাঁকে নিরন্তর স্মরণ করার আগ্রহ।

৫. প্রভুকে ভৃত্য যেভাবে সেবা করে তেমনিভাবে তাঁর সেবা করার প্রবল ইচ্ছা।

৬. সখারূপে তাঁর প্রতি অনুরাগ।

৭. তাঁকে সন্তানরূপে ভালবেসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

৮. স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ তাঁর সঙ্গেও সেইরকম প্রেমের অনুভূতি।

৯. তাঁর কাছে আত্মনিবেদনের তীব্র আকুতি।

১০. তাঁতেই তন্ময় হয়ে থাকার একান্ত অভিলাষ।

১১. তাঁকে না পাওয়ার যে দুঃখ অন্তরে সেই দুঃখ জাগ্রত থাক এই বাসনা।

ব্যাখ্যা ঃ ভক্তের জীবনে ভক্তি এমনি বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হতে পারে, আবার এর যে কোন একটি তাঁরমধ্যে স্ফুরিত হতে পারে। আর এরা বিভিন্ন হলেও কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বলেই মনে করা হয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমের পরাকাষ্ঠায় তাঁর মনে অনেক ভাবই বিকশিত হয়।

প্রথমে বলা হয়েছে মাহাত্ম্যকীর্তনাসক্তি। ভক্তের যাত্রা আরম্ভ হয় এই মাহাত্ম্য কীর্তনের মাধ্যমেই। তাঁর লীলা ও তাঁর মহিমা ধ্যান করতে করতে ক্রমশ তাঁতে আসক্তি জন্মায় ও আসক্তি যতই গভীর হয় ততই তা আমাদের পরাভক্তির পথে অগ্রসর করে।

দ্বিতীয়ত, রূপাসক্তি। গুণ বর্ণনের থেকে তাঁর অনুপম সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিবিড়তর করে। পূজাসক্তি তৃতীয় বিভেদ। তাঁকে নানাভাবে সেবা করতে করতে সেবাতে একটা প্রীতি আসে,

যে প্রীতির পরিণতি হয় ভক্তিতে। তারপর স্মরণাসক্তি। তাঁকে স্মরণ করতে করতে ভক্তের এমন অবস্থা হয় যে স্মরণ না করে থাকা যায় না।

এরপর আসে তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন সম্বন্ধ পাতানো। প্রথমটি দাস্যভাব। ভগবানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপনের এটি প্রথম ধাপ। ভক্ত এখানে ভগবানকে প্রভু ও নিজেকে ভৃত্য ভাবেন [ও প্রাণঢালা সেবা করেন। এই সেবা ভক্তিরই প্রকারভেদ]।

এই সম্বন্ধ আর একটু ঘনিষ্ঠ হয় সখ্যভাবে। ভৃত্যভাবে সেবায় ভক্ত নিজেকে ভগবানের থেকে ছোট (হীন) ভাবে। তাই একটা দূরত্বের ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু সখ্য ভাবের সাধনায় ভক্ত যেন তাঁর সমকক্ষ। এখানে উভয়ের মধ্যে কোন দূরত্ব বা সঙ্কোচ থাকে না। এই ভাবের এটাই মনোহারিত্ব।

কিন্তু প্রেমের গভীরতা আরও বেশি প্রকট হয় তাঁকে সন্তানভাবে ভালবাসায়। ভক্ত এখানে পিতা বা মাতার ভূমিকা নেন আর ভগবান তাঁর শিশু সন্তান। এ বড় মধুর সম্বন্ধ। এখানে কোন বিনিময়ের ও দান প্রতিদানের প্রশ্ন নেই। পিতা-মাতা যেমন শিশুর কাছে কিছু আশা করেন না, শুধু ভালবাসা দিয়ে তাকে ঘিরে রাখেন, এখানে ভক্তও তেমনি ভগবানের কাছে কিছু চান না, বরং তাঁকেই ভালবাসা, যত্ন ও নিরাপত্তা দিতে ব্যস্ত থাকেন। স্বভাবতই এটি হলো সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই ভাবের অনুসরণ ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি আসক্তির সৃষ্টি করে ও তাঁকে পরমপ্রিয় করে তোলে।

এরই পরে কান্তাসক্তি বা মধুর ভাব। ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধে এইভাব শ্রেষ্ঠতম। এটি দয়িতা ও দয়িত—এই দুজনের মধ্যে নিকটতম (ঘনিষ্ঠ) সম্বন্ধ। তাঁকে সব চেয়ে আপন করে পাওয়া যায় এই ভাবের মধ্যে। প্রেমের তীব্রতা এর থেকে বেশি আর কোন ভাবে নেই।

আত্মনিবেদনাসক্তিতে ভক্ত ভগবানের কাছে 'তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক'—এই মনোভাবে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার জন্য ব্যাকুল হন। তিনি তাঁর কাছে কিছু চান না, বরং তিনি যা কিছু পেয়েছেন সব তাঁরই কৃপায় পেয়েছেন—এই মনে করেন। তিনি ভাগবতী ইচ্ছার কাছে সর্বতোভাবে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য সর্বক্ষণ উৎসুক থাকেন। তন্ময়াসক্তির অর্থ ভগবানে তন্ময় হয়ে থাকাই ভক্তের বাসনা। এই তন্ময়তা এতদূর গভীর হতে পারে যে ভক্ত ভগবানের মধ্যে প্রভেদও তখন দূর হয়ে যায়। তখন কেবলমাত্র ভগবানই থাকেন—ভক্ত তাঁর প্রেমে এমনই নিমজ্জিত হন যে তাঁর আর নিজের পৃথক অস্তিত্বের অনুভূতি থাকে না। তাঁর ব্যক্তি সত্তার ভগবৎসত্তায় বিলোপ ঘটে।

পরম বিরহাসক্তি এই বিবিধ ভক্তিভাবের শেষ কথা। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানকে না পাওয়ার যে তীব্র বেদনা সেই বেদনার প্রতি আসক্তি। যেসব মুহূর্তগুলিতে তিনি ঈশ্বরের থেকে বিযুক্ত থাকেন সেসব মুহূর্ত তাঁর কাছে দুঃসহ বলে বোধ হয়। অথচ সেই দুঃখ থেকে ভক্ত পরিত্রাণও চান না। তাই একে আসক্তি বলা হয়েছে। তাঁকে না পাওয়ার উদ্বেগ থেকেই এই বেদনাবোধ, তাই এই দুঃখ দূর হোক তিনি চান না। কারণ এই বেদনাই ঈশ্বরের প্রতি তাঁকে তন্ময় করে রাখে। তীব্র বিরহ বোধই ভক্তিলাভের শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপায়। ভক্ত হৃদয়ে এই বেদনাবোধের উদয়ে বোঝা যায় যে ঈশ্বর লাভ আসন্ন।

এই সূত্রে যে বিভিন্ন ভালবাসার কথা বলা হলো এসবই কিন্তু একই ঈশ্বরপ্রেমের বিচিত্র প্রকাশ। এই প্রেম ঐ একাদশ প্রকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এর যে কোন একটি অবলম্বন করেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। ভক্ত তাঁর নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন একটি ভাব অবলম্বন করতে পারেন। তাই সূত্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বর্ণনা দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, ভগবানের প্রতি তীব্র ভালবাসা আনতে হলে তাঁর সঙ্গে যে কোন একটা সম্বন্ধ তৈরি করতে হয়। ভক্ত ভগবানকে দাসভাবে, বন্ধুভাবে, সন্তানভাবে বা প্রেমাস্পদরূপে ভজনা করবে। এছাড়া আর একটি আছে শান্তভাব। এতে তাঁর প্রতি অনুরাগের সঙ্গে যুক্ত থাকে শ্রদ্ধা ও সমীহের ভাব। এতে কোন ভাবোচ্ছ্বাস থাকে না। সমস্ত প্রবৃত্তিকে সংযত করে স্থির শান্ত মনে ভক্ত নীরবে নিভৃতে ঈশ্বরের চিন্তা করেন, তাঁর ধ্যান করেন। এইজন্য একে শান্তভাব বলা হয়। মনের সব প্রবৃত্তি তখন শুদ্ধ হয়, মন তখন হয় একটা নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো। এই শান্তভাবেও কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে একটা দূরত্বের ভাব থাকে। যেমন দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের সময় অনেক মুনি ঋষি ছিলেন যাঁদের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও নিজেদের তাঁরা এত সামান্য মনে করতেন যে তাঁর সান্নিধ্যে (নিকটে) যেতে সঙ্কুচিত হতেন। ভাগবতে এঁদের সম্বন্ধে একটি সুন্দর শ্লোক আছে—

'আত্মরামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥' (১-৭-১০)

শ্রীহরির এমন মহিমা যে যাঁদের সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে, যাঁরা ঈশ্বরের আনন্দে নিমজ্জিত, সেই ঋষিগণেরও তাঁর প্রতি অহৈতুকি ভক্তি দেখা যায়।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির প্রথম সোপান এই ধরনের কোন সম্বন্ধ-স্থাপন। তার এই সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত যে রাখতে হবে তা নয়। আরম্ভে এটির প্রয়োজন থাকলেও পরে একে অতিক্রম করে যেতে হবে। অবশ্য কোন সম্বন্ধ স্থাপন না করেই মুনিঋষিরাও তাঁদের নিজেদের মতো শান্তভাবে উপাসনা করতে পারেন এবং তাতেও সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।

তবে ভক্তির সাধনায় ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হওয়া দরকার। যে সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একটা দূরত্ব থাকে তাতে ভক্তের পরিতৃপ্তি নেই। তাই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্থাপন করতে চান।

এই সম্বন্ধগুলি কেমন তা আগেই বলা হয়েছে, এবার উদাহরণ দিয়ে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রথমটি হলো দাস্যভাব—ঈশ্বরকে প্রভু হিসেবে কল্পনা করে নিজেকে তাঁর ভৃত্য বা সেবক হিসেবে দেখা। এখানে উচ্ছ্বাস নেই, কিন্তু আছে সম্পর্কের নিবিড়তা। ভৃত্য তার প্রভুকে নিঃসন্দেহে সমীহ করে চলে, কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটা ভালবাসার সম্পর্ক আছে। ভৃত্য তার প্রভুকে শুধু সম্মানই করে না, তাঁকে ভালও বাসে। এটি একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। রামায়ণে হনুমান ও শ্রীরামচন্দ্রের সম্পর্ক দাস্য ভক্তির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। হনুমান রামচন্দ্রের পরম ভক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের সেবা ছাড়া তাঁর জীবনে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। প্রভুর সেবাতেই তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

সখ্যভাবে ঈশ্বরকে ভক্ত বন্ধুরূপে চিন্তা করেন। বন্ধুর মহত্ত্বের দিকটা তার বন্ধুর কাছে বড় নয়। মহত্ত্বের ধারণা দুজনের মধ্যে একটা ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। তার মত হচ্ছে, আমার বন্ধু অন্যদের কাছে যত মহৎই হোক, আমার কাছে সে সখাই, আমার সমকক্ষ। বৃন্দাবনলীলায় গোপবালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা এই সখ্যভাবের সুন্দর দৃষ্টান্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে অতি চমৎকারভাবে এর বর্ণনা আছে।

বৃন্দাবনলীলায় গোপবালকরা শ্রীকৃষ্ণকে কখনও নিজেদের থেকে বড় ভেবে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাঁর কাঁধে উঠতেও তাঁদের সংকোচ ছিল

না; তাঁকে নিজেদের উচ্ছিষ্ট খাওয়াতেও দ্বিধা করেনি। এরকম ব্যবহার তখনই সম্ভব যখন পরস্পরের মধ্যে অতি সহজ ও আন্তরিক একটা ভাব থাকে। আর এ ভাব বন্ধুতে বন্ধুতেই সম্ভব। তারা পরস্পরকে সমশ্রেণীই ভাবে, পরস্পরের কাছে কিছু গোপন করে না, যে কোন বিষয়েই পরস্পরের সুখেই তারা সুখী হয়। বৃন্দাবনের গোপ বালকদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ছিল এইরকম সম্বন্ধ।

বৃন্দাবনলীলায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার মনোভাব, বাৎসল্যভাবের এও এক সুন্দর কাহিনী। প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন বসুদেব ও দেবকীর পুত্র। যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন সেদিনই তাঁকে অনেক দূরে এক দম্পতির গৃহে রেখে আসা হয়। সেই দম্পতিই নন্দ ও যশোদা। তাঁরা ছিলেন অতি সরল ও সাধারণ ব্যক্তি। গোচারণ, দুধ ও দুধের থেকে প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রি করা ছিল তাঁদের বৃত্তি বা জীবিকা। কংস যদি কৃষ্ণকে খুঁজে পায় ও হত্যা করে তাই কৃষ্ণকে সেখানে সরিয়ে দেওয়া হয়। সংক্ষেপে এই হলো কাহিনী।

শোনা যায় যীশুখ্রীস্ট সম্বন্ধেও এ ধরনের এক কাহিনী আছে। বেথেলহেমে যীশু যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন গুপ্তচরেরা খবর দিয়েছিল যে, সদ্যোজাত এই শিশুই ইহুদীদের রাজা হবে। হেরড তাই শিশুটিকে হত্যা করার জন্য তৎপর হওয়ায় যীশুকে মিশর দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। যাতে হেরড তাঁর সন্ধান না পান। হেরড তখন কোন্ শিশুটি যীশু তা বুঝতে না পেরে বেথেলহেমের সমস্ত শিশুকে হত্যার নির্দেশ দেন। তিনি ভাবেন যীশু এর মধ্যে নিশ্চয় একজন হবেন ও এই গণহত্যায় তাঁর মৃত্যু অনিবার্য। অনুরূপভাবে রাজা কংসও কৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছিল। সেজন্যই মথুরায় যে কারাগারে কৃষ্ণের পিতামাতা বন্দী

ছিলেন, যেখানে তাঁর জন্ম সেখান থেকে সরিয়ে যমুনা পার করে বসুদেব তাঁকে নন্দগৃহে রেখে এলেন। ঠিক সেই সময়ই যশোদারও একটি মেয়ে হয় কিন্তু অচেতন যশোদা জানতেন না সদ্যোজাত সন্তান ছেলে না মেয়ে। বসুদেব কৃষ্ণকে যশোদার কাছে রেখে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে চলে আসেন। এরপর থেকে নন্দ ও যশোদার (এই) গভীর ভালবাসার কথা ভাগবতে অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানলেও তাঁর মাহাত্ম্য তাঁদের কাছে কখনও বড় হয়ে ওঠেনি। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ যখন নানা অদ্ভুত অলৌকিক কাজও করেছেন তাঁরা ভাবতেন এ নিশ্চয়ই কোন অপদেবতার কাজ ও আর পাঁচজন পিতা-মাতার মতোই তাঁরা কৃষ্ণের কল্যাণের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করতেন। ইনি যে শিশুরূপী ভগবান স্বয়ং—এই ঐশ্বর্যবোধ তাঁদের বাৎসল্যরসকে কোথাও ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

কৃষ্ণ যে স্বয়ং ঈশ্বর একথা যশোদা নানাভাবে বারবার জেনেছেন কিন্তু তাতে তাঁর কিছু যায় আসেনি। ভক্ত যেভাবে ভগবানকে ভক্তি করেন—নন্দ-যশোদার মনে সে ভাব কখনও জাগেনি। কৃষ্ণ ভগবান হতে পারেন কিন্তু যশোদার কাছে তিনি অবোধ শিশুমাত্র। নন্দ-যশোদার সঙ্গে কৃষ্ণের এই যে বাৎসল্য সম্বন্ধ—এতে কোন মহত্ত্বের ঐশ্বর্যের আবরণ না থাকায় ভক্ত ভগবানের যে ভেদ তা এখানে অনুপস্থিত। বরং তাঁরা ভাবেন যে কৃষ্ণ একমাত্র তাঁদের ভালবাসার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে আছেন। কৃষ্ণকে যত্নে রাখা তাঁকে নিরাপত্তা দেওয়া তাঁদেরই কাজ। কৃষ্ণকে তাঁরাই রক্ষা করেন, কৃষ্ণ তাঁদের নয়। এই বাৎসল্যরসের মতো নিঃস্বার্থ সম্বন্ধ আর দ্বিতীয়টি নেই। তাই ঈশ্বরকে সন্তানরূপে ভাবনা ঈশ্বরপ্রেমের শুদ্ধতম রূপ।

এর পরবর্তী স্তর হলো তাঁকে পতিরূপে বা পরম প্রেমাস্পদরূপে ভজনা। এখানে ভক্ত নিজেকে পত্নী বা প্রেমিকা ভাবেন আর ঈশ্বর তাঁর পতি বা প্রেমিক। বলা হয় যে লৌকিক যত সম্বন্ধ আছে তাদের মধ্যে এই সম্বন্ধেই আবেগের তীব্রতা চরম পর্যায়ে ওঠে।

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যে যে সম্বন্ধ এই মধুরভাবের সেটাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তাঁরা কিন্তু স্বামী-স্ত্রী ছিলেন না। কৃষ্ণ প্রেমিক, রাধা প্রেমিকা। তাঁদের এইভাবে বর্ণনা করা এইজন্যই যে এই সম্বন্ধেই প্রেম তীব্রতার উচ্চতম স্তরে পৌঁছতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি যে ভালবাসা তা যেন পূর্ব থেকেই কিছুটা অবধারিত। একজন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার যে তীব্র ইচ্ছা ও আবেগ থাকে তা দাম্পত্য প্রেমে থাকে না। ভগবানের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ যে কত গভীর কত নিবিড় হওয়া সম্ভব তা একমাত্র এই মধুর ভাবের সাধনাতেই বোঝা যায়।

সাধারণের চোখে এই প্রেম অনৈতিক মনে হতে পারে কারণ এর মধ্যে তাঁরা ইন্দ্রিয় সম্পর্ক বা কামের কথা ভাবেন। কিন্তু এই বিশুদ্ধ প্রেমকে সেই দৃষ্টিতে দেখলে হবে না। ভগবানের প্রতি ভক্তের অনুরাগের তীব্রতা বোঝাবার জন্য এছাড়া অন্য দৃষ্টান্ত নেই। সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে প্রেমিক প্রেমিকার পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার যে চরম উৎকণ্ঠা তা একমাত্র এই লৌকিক সম্বন্ধতেই কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। [প্রভেদ এটাই যে লৌকিক ক্ষেত্রে যা কাম, রাধাকৃষ্ণলীলায় তা কামগন্ধহীন বিশুদ্ধতম প্রেম]।

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধবারুণি-বলি-হনুমদ্‌বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্যাঃ ॥ ৮৩ ॥

অন্বয় ঃ ইতি এবম্ (এইরূপ) বদন্তি (বলেন) জনজল্পনির্ভয়াঃ (লোকমত অগ্রাহ্যকারী) একমতাঃ (অনুরূপ মত বিশিষ্ট) কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধব-আরুণি-বলি-হনুমৎ-বিভীষণ আদয়ঃ (প্রভৃতি) ভক্ত্যাচার্যাঃ (ভক্তি পথের আচার্যগণ)।

অর্থ ঃ লোক কি বলবে সে মত উপেক্ষা করে কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিন্য-শেষোদ্ধব-আরুণি-বলি-হনুমৎ-বিভীষণ প্রভৃতি ধর্মশিক্ষকগণ অবিসংবাদিতভাবে এই কথাই ঘোষণা করেছেন।

ব্যাখ্যা ঃ কুমার-ব্যাস থেকে আরম্ভ করে বিভীষণাদি পর্যন্ত মহাত্মাদের মত উল্লেখ করে নারদ উপসংহারে বলছেন যে এঁরা সকলেই তাঁর সঙ্গে একই মত পোষণ করেন। নারদ বলতে চাইছেন যে তিনি নতুন কোন নিজস্ব ভাবধারার প্রবর্তন করেননি। ভক্তিপথে যাঁরা পূর্বসূরি তাঁদের অভিজ্ঞতার পথ ধরেই তিনি চলেছেন—কোন মতপার্থক্য নেই তাঁদের সঙ্গে। এইজন্য বিভিন্ন ভক্তের নাম উল্লেখ করে তিনি দেখাচ্ছেন যে এঁরা প্রত্যেকেই কিভাবে নিজেদের জীবনে এই সমস্ত বিভিন্ন ভাবের এক বা একাধিক ধারায় সাধনা করেছেন।

এইসব সাধকেরা কেউই ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে কোন লোকাপেক্ষা রাখেননি। সাধারণ লোকে এই সব সাধনার গূঢ় মর্ম বুঝতে না পেরে

বিদ্রূপ বা সমালোচনায় মুখর হতে পারে, হয়ও। কিন্তু ভক্ত তাতে বিচলিত হন না। লোকে কি মনে করছে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁরা ঠিক পথেই চলেছেন এবং এই পথ তাঁকে পরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে, এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা নিজের ভাবানুযায়ী সাধনপথে অগ্রসর হন। লোকের সমালোচনাতে তাঁরা ভীত হন না।

কিন্তু সত্যকারের আচার্যস্থানীয় এমন কোন মহাত্মা যদি কোন মন্তব্য করেন তবে ভক্তকে চিন্তা করতে হয়, সতর্ক হতে হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এই ভক্তিপথের আচার্যগণ প্রায় সকলেই সাধন ও সাধনের কার্যকারিতা সম্বন্ধে একই মত পোষণ করেন আর তাঁরা সেই মতোই শিক্ষা দেন।

অন্যান্য ব্যক্তি কিন্তু ভক্তিমার্গের কঠোর সমালোচনা করেন। জ্ঞানমার্গী বলেন—এইসব ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে কি লাভ হয়, এ পথ সাধককে কোথায় নিয়ে যাবে? এ পথে মোক্ষ বা মুক্তি—যা জীবনের পরম লক্ষ্য, তা আসতে পারে না। কিন্তু এ ধরনের কঠোর সমালোচনা ভক্তকে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে যখন ভগবানের নাম করতেন তখন তাঁর গুরু পরম বৈদান্তিক তোতাপুরী পরিহাস করে বলেছিলেন, 'রুটি ঠুকছ কেন?' (আগে দুহাতের তালুতে আটা [আটার লেচি] নিয়ে ঠুকে ঠুকে রুটি বানাবার পদ্ধতি ছিল) এই রকম নামকীর্তনে যে ঈশ্বরলাভ হয় এ ধারণা তোতাপুরীর ছিল তো না-ই, বরং এসব ভাবকে তিনি উপহাসই করতেন।

আবার যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে বেদান্ত সাধনের কথা বললেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যাই মাকে জিজ্ঞাসা করে আসি' আর তারপর

যখন মন্দির থেকে জগন্মাতার অনুমতি নিয়ে ফিরলেন তখন অবাক বিস্ময়ে তোতাপুরী ভাবলেন—এ আবার কি? এ বেদান্ত সাধনের এমন উপযোগী আধার, অথচ মনে এত সংস্কার। বিগ্রহের কাছে অনুমতি আনতে যায়! পাষাণ মূর্তির সঙ্গে সন্ন্যাসের কি সম্বন্ধ?

বেদান্ত মতে রূপ, প্রতীক বা বিগ্রহ—এ সবই অনাবশ্যক। একমাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্ম, তাঁর তুলনায় এসবই অবান্তর কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং এই কল্পিত দেবমূর্তির কাছে গিয়ে অনুমতি চাওয়ার কোন অর্থ হয় না, এই ছিল তোতাপুরীর অভিমত। এইভাবে জ্ঞানপন্থী ও অন্যান্য মতাবলম্বীরা ভক্তিমার্গের বিরূপ সমালোচনা আজও করেন, কিন্তু ভক্ত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাসে অটল থেকে এবং সে মতামতকে মূল্য না দিয়ে নিজের পথেই চলেন।

আমরা এইবার নারদীয় ভক্তিসূত্রের উপসংহারে এসে পৌঁছেছি। এই গ্রন্থের আলোচনায় সাধনার একটি বিশেষ ধারার ইঙ্গিত দেয়া হলো। এমন নয় যে এই-ই একমাত্র পথ তবে অন্যান্য পথের মধ্যে এ-ও একটা বিশিষ্ট পথ। নারদ বিনম্রভাবে বলেছেন যে তিনি অন্যরা বলে যাননি এমন কোন নতুন তথ্য এখানে পরিবেশন করেননি। নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি পূর্বসূরিদের মত বারবার উদ্ধৃত করেছেন। এখানে শেষকালেও তাই বলছেন, লোকাপবাদের ভয়ে ভীত না হয়ে পূর্বাচার্যগণও একমত হয়ে এই ভক্তিমার্গের কথা বলেছেন। তাঁদের নাম উল্লেখ করে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে নতুন কোন ধর্মের স্রষ্টা এ দাবি তিনি করেন না। সত্য চিরকালই এক—বিভিন্ন ধর্মাচার্যরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই একই সত্যকে বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করে চলেছেন।

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধতে
স ভক্তিমান্ ভবতি সঃ প্রেষ্ঠং লভতে
সঃ প্রেষ্ঠং লভত ইতি ॥ ৮৪ ॥

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) ইদং (এই) নারদ প্রোক্তং (নারদের কথিত) শিবানুশাসনং (শুভ অনুশাসন) বিশ্বসিতি (বিশ্বাস করেন) শ্রদ্ধতে (শ্রদ্ধা করেন) সঃ (তিনি) ভক্তিমান্ ভবতি (ভক্তি লাভ করেন) সঃ (তিনি) প্রেষ্ঠং (সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু) লভতে (লাভ করেন)।

অর্থ ঃ যিনি এই নারদীয় ভক্তির শিক্ষায় বিশ্বাস করেন ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই উপদেশ অনুসরণ করেন, তিনি ভগবানের ভক্ত বলে পরিচিত হন এবং তিনি জীবনের লক্ষ্য সেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেন।

ব্যাখ্যা ঃ প্রথমত, বক্তব্য বিষয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বিতীয়ত, বিষয়টি সমাপ্ত হয়েছে বোঝাবার জন্য এই সূত্রে 'প্রেষ্ঠং লভতে' বাক্যাংশটি দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

অন্তিম সূত্রে নারদ বলেছেন যে, তাঁর কথিত এই সৎ ও শুভ উপদেশে যাঁর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে তিনি এই ভক্তি লাভ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু প্রাপ্ত হন, জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হন।

এই সূত্রগুলিতে নারদ কোথাও তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে চাননি। ভক্তি সূত্রে প্রতিটি উপদেশই অতি সহজ, অনায়াসবোধ্য এবং অক্লেশে অনুসরণ করা সম্ভব। পরম লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভক্তির পথই জনপ্রিয় পথ। কারণ এতে বিশেষ বিদ্যাবত্তার বা কঠোর তপস্যার

প্রয়োজন হয় না। বরং ভক্তিযোগের আচার্যরা অত্যধিক কঠোরতার বিরোধী। আবার অধিক পাণ্ডিত্যও কখনও কখনও আমাদের মনে একটা অহঙ্কার সৃষ্টি করে, ভাবে সে কত জ্ঞানী। অপরদিকে ভক্তিযোগে বিনম্রতাই অন্যতম সাধন। ভক্তিমার্গেও বহু বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন এ কথা সত্য হলেও ভক্তির মাপকাঠি জ্ঞান নয়। ভক্তি পথে তার আলাদা কোন মূল্য নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন যে, ছেলে জানে না তার বাবা কত বড়লোক তবু সেও বাবাকে ভালবাসে, বাবাও তাকে ভালবাসেন। এই ভক্তিপথে বিধিপূর্বক কোন অনুষ্ঠানাদি নিখুঁতভাবে করা বাধ্যতামূলক নয়। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ উদাহরণ দিচ্ছেন যে ছেলে হয়তো স্পষ্ট করে 'বাবা' উচ্চারণও করতে পারে না, অস্ফুট দু-চারটে শব্দ বলে, কিন্তু বাবা তাতেই বোঝেন যে ছেলে তাঁকেই খুঁজছে।

সুতরাং শাস্ত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে মন্ত্র উচ্চারণ সম্বন্ধে যে বিশেষ নিয়ম দেখা যায় তা না মানতে পারলেও ক্ষতি নেই এখানে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঈশ্বরের জন্য ঐকান্তিক ব্যাকুলতা। কোন বৈধী অনুষ্ঠান অথবা নিয়ম করে কোন সাধনা যে করতেই হবে তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে এটাই দেখতে পাই তিনি যখন জগন্মাতাকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন তখন তাঁকে ডাকবার জন্য তিনি যে বিশেষ কোন সাধন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা নয়। ব্যাকুলতা বা আর্তিই তাঁর সম্বল ছিল। মাকে দর্শনের জন্য তাঁর হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যেত। ভক্তিযোগের অনুশীলনে নির্দিষ্ট কোন অনুষ্ঠান ইত্যাদির যে প্রয়োজন হয় না এটাই তিনি নিজের জীবনে দেখিয়ে গেলেন। শাস্ত্রাদির সঙ্গে ভক্তের পরিচয় থাকতেও পারে, না-ও থাকতে পারে। বৈধী পূজার নিয়ম জানা থাকলে তিনি বিধিমত পূজা করতে পারেন কিন্তু ভগবানকে পাবার জন্য তা অপরিহার্য

নয়। তাঁর এই তীব্র ব্যাকুলতা আসার আগে পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রে যেমন যেমন বলা আছে সেই অনুযায়ী পূজা করতেন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমে পাগল হবার পর এই বিধিবদ্ধ পূজায় তাঁর আর মন রইল না, নিয়ম আচার সমস্ত ভুল হয়ে যেতে লাগল। তখন আর মায়ের পূজার সময় কোন বৈধী আচরণই তিনি পালন করতে পারতেন না। তিনি যেন তখন জগন্মাতার একটি ছোট্ট ছেলে। যদিও তিনি পূর্ব থেকেই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিন্তু মন্ত্র জপাদিতে তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেননি। শাস্ত্রোক্ত বৈধ ধর্ম পালন না করেও যে কেবলমাত্র আন্তরিক ভালবাসাতেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় একথাই তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করলেন। ভক্তিযোগের এই হলো বৈশিষ্ট্য।

আবার এই ভক্তিযোগে বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্যেরও তেমন প্রয়োজন নেই। নারদ স্বয়ং অতি বিদ্বান ছিলেন, কিন্তু ভক্তিসূত্র রচনায় তিনি বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেননি, সমস্ত গ্রন্থের কোথাও তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে শাস্ত্রাদি থেকে কোন উদ্ধৃতি দেননি। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি অনায়াসেই শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা দরকার মনে করেননি এটাই বিশেষভাবে বোঝাবার জন্য যে ভক্তির সাহায্যে ঈশ্বরের পথে এগোবার জন্য বা তাঁকে পাবার জন্য পণ্ডিত হবার কোন দরকার নেই। শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁর সাধনজীবনে এটাই দেখিয়েছেন।

সামাজিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও ঈশ্বরলাভের কোন সম্পর্ক নেই। নারদ নিজে ছিলেন দাসীপুত্র। তাঁর পূর্বপুরুষদের বিষয় কিছুই জানা যায় না। নারদকে কোথাও কোথাও ব্রহ্মকুমার বা ব্রহ্মার পুত্র বলা হয়েছে বটে কিন্তু তা কথার কথা মাত্র। ভাগবতে নারদের যে কাহিনী সেখানেও তাঁর

বংশ বা পিতৃপরিচয় পাওয়া যায় না। আমরা শুধু জানতে পারি যে তাঁর মা ছিলেন দাসী এবং নারদের মনে অতি শৈশবেই বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়েছিল। তিনি সেই বয়সেই আদর্শ রূপায়ণের জন্য, ভগবদ্দর্শনের জন্য সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থেকে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতেন ও পরিণামে ভগবান শ্রীহরি তাঁর সামনে আবির্ভূত হন। এই কাহিনীতে এটাই দেখানো হয়েছে যে, ভগবান লাভের জন্য উচ্চ বংশ, উচ্চ-জাত বা বড় সাধু বা মহান ঋষির পুত্র না হলেও চলে। সমাজের যে কোন স্তরের যে কোন ব্যক্তিই নির্দ্বিধায় ভক্তিযোগ অবলম্বন করতে পারে এবং তাঁর সাধনায় যদি নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা থাকে তবে তার অনিবার্য পরিণাম ঈশ্বরপ্রাপ্তি।

এই ভক্তিপথের যাত্রী যাঁরা তাঁদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য নারদ বলেছেন যে তিনি ভক্তিসূত্রে যে উপদেশ দিয়েছেন তা তাঁর পূর্ববর্তী আচার্যবৃন্দও বলেছেন। শিব স্বয়ং এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন, নারদ তার বিবৃতকারীমাত্র। এই উপদেশ যাঁরা বিশ্বাস করেন ও তদনুযায়ী সাধন করেন তাঁদের কি লাভ হয়? না, তাঁরা ভক্তিধন লাভ করেন ও অন্তিমে পরম সত্য ও সুন্দরকে উপলব্ধি করেন। অধ্যায় এবং গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বোঝাতে দ্বিরুক্তি করা হয়েছে। অথবা সেই পরম বস্তু পরম প্রেমাস্পদকে লাভের অনিবার্যতা ইঙ্গিত করেই এই দ্বিরুক্তি। এখানে দুটি বিষয় আছে—ঈশ্বরে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও সক্রিয় ভক্তির সাধন (যা) ভক্তিলাভের সহায়ক। উপর উপর ভাসা ভাসা মৌখিক বিশ্বাসমাত্র যথেষ্ট নয়। এই শ্রদ্ধা ও সাধন দ্বারা জীবনটাকেই নূতনভাবে গড়তে হবে। তবেই এই শিক্ষা কার্যকরী হবে। ভক্ত না হয়েও একজন পণ্ডিত ভক্তিযোগ সম্বন্ধে সারগর্ভ আলোচনা করতে পারেন।

এ বিষয়েও শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন, ভাগবত ব্যাখ্যাকারী এক বড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রত্যহ এক রাজসভায় ভাগবত ব্যাখ্যা করতেন আর প্রতিদিন ব্যাখ্যা শেষে রাজাকে বলতেন—"রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলে—আগে তুমি বোঝ! পণ্ডিত বাড়ি গিয়ে রোজ ভাবে—রাজা এমন কথা কেন বলে যে তুমি আগে বোঝ। লোকটা সাধন ভজন করত—ক্রমে চৈতন্য হলো। তখন দেখলে যে হরিপাদপদ্মই সার, আর সব মিথ্যা। সংসারে বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। কেবল একজনকে পাঠালে রাজাকে বলতে যে—রাজা, 'এইবারে বুঝেছি'।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, পৃঃ ৭৫১) কাহিনীর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কেবল বুদ্ধির দ্বারা জানা প্রকৃত জ্ঞান নয়, তা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, "পাণ্ডিত্য! শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? শকুনিও অনেক উঁচুতে উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে—কোথায় পচা মড়া। পণ্ডিত অনেক শ্লোক ফড়র ফড়র করতে পারে, কিন্তু মন কোথায়? যদি হরিপাদপদ্মে থাকে, আমি তাকে মানি, যদি কামিনী-কাঞ্চনে থাকে তাহলে আমার খড়কুটো বোধ হয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, পৃঃ ১০৮১) সে পাণ্ডিত্য অনেক যশ আর খ্যাতি এনে দিতে পারে, কিন্তু মুক্তি এনে দিতে পারে না। তাই তার কোন দাম নেই। ভক্তিযোগে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ্বরসন্ধানীর দৃষ্টিতে বৈরাগ্য একটা বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ কথা, খুব বড় গুণ। জ্ঞানী যে দৃষ্টিতে জগতকে দেখেন ভক্ত সে দৃষ্টিতে দেখেন না। তাই ভক্তের কাছে বৈরাগ্যের অর্থ ভিন্ন ধরনের। অন্তরের অন্তস্তলে ভক্ত জানেন যে তিনি যা চান, যা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধন, এ পৃথিবীতে তা পাবার নয়। তিনি চাইছেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ছাড়া এ জগতের কোন মূল্য নেই তাঁর কাছে। সে জগৎ তাঁকে ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্যুত করে। গল্পে

আছে, সীতাদেবী হনুমানের ভক্তিতে প্রীত হয়ে তাঁকে নিজের গলার মুক্তোর মালাটি উপহার দেন। আর বানর যেমন করে সেই স্বভাব অনুসারে হনুমান সেই মালা কামড়ে মুক্তোগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে চতুর্দিকে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। এই দেখে কেউ কেউ মন্তব্য করল—মুক্তোর মূল্য বানরে কি বুঝবে? এই অমূল্য মুক্তোমালা বানরের হাতে পড়ে নষ্ট হলো। অন্য একজন হনুমানকেই প্রশ্ন করলেন, 'তুমি মুক্তোগুলো ভেঙে ফেলছ, ছুঁড়ে দিচ্ছ, জান না এ কত দামী জিনিস!' হনুমান উত্তর দিলেন, 'ভেঙে ভেঙে দেখছিলাম যে এই মুক্তাগুলির ভিতরে শ্রীরাম আছেন কিনা। তাঁকে দেখতে পেলাম না বলে এগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছি।' প্রশ্নকর্তা বললেন, 'তোমার এই শরীর, এরমধ্যে কি রাম আছেন? তাহলে তুমি দেহটা ফেলে দিচ্ছ না কেন?' হনুমান তখন বুক চিরে দেখালেন শ্রীরামচন্দ্র তাঁর হৃদয়ে বসে আছেন। তা নাহলে এই শরীরটাও ফেলে দিতেন। এই হলো প্রকৃত ভক্তের মনোভাব। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বস্তু যত অমূল্যই হোক তাঁর কাছে মূল্যহীন। এ শিক্ষা যে নারদই একমাত্র দিয়েছেন তা নয়, পূর্বাচার্যদেরও এই অভিমত।

এইবার শেষকালে সমস্ত আলোচনার নিষ্কর্ষ সংক্ষেপে বলছেন, 'যঃ বিশ্বসিতি—যঃ শ্রদ্ধতে' ইত্যাদি। 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, ও 'বিশ্বাস' বলতে শাস্ত্রজ্ঞান ছাড়াই আমাদের যে সহজাত বিশ্বাস। শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যাঁর আছে তিনিই অনুভব করেন। কি অনুভব করেন? তিনি তাঁর প্রিয়তম যে ঈশ্বর তাঁকে অনুভব করেন। অতি সুন্দরভাবে ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে এখানে ঃ 'সঃ প্রেষ্ঠং লভতে।' এখানে একথাই বোঝানো হয়েছে যে সগুণ ঈশ্বরই শুধু নন, যদি ভক্তের ইষ্ট হন নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁকেই তিনি অনুভব করেন। তিনিই ভক্তের প্রিয়তম-প্রেষ্ঠ—তাঁর জীবনের

পরমাস্পদ। সেই পরম বস্তু লাভ হলে তারপর আর কিই-বা প্রাপ্তব্য থাকে? কিছুই না। তাঁর তখন সমস্ত বাসনা চরিতার্থ হয়েছে, তিনি তখন প্রশান্তচিত্ত প্রিয়তমের প্রতি ভালবাসায় হৃদয় পরিপূর্ণ এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম। ভক্তের প্রেমের এই পরম অবস্থা, এই অপূর্ব বিষয়ের যে আলোচনা তার এক অপূর্ব পরিসমাপ্তি।

কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের জন্য বা ব্যক্তিবিশেষের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এই ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা উচিত নয়। জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এক বস্তু প্রাপ্তির জন্যই এই শাস্ত্রের অনুশীলন করা। ঈশ্বরে যুক্ত থাকা, তাঁকে লাভ করা, তাঁর নিত্য সঙ্গ জীবনের পরম প্রয়োজনীয় প্রাপ্তি। ভক্তিযোগের দ্বারা সেই প্রাপ্তিই লাভ করা যায়। অপরে স্তুতিই করুক নিন্দাই করুক ভক্তের সেদিকে দৃকপাত থাকে না। এমনকি সাধারণ লোকের থেকে অন্য প্রকৃতির হবার জন্য লোকে তাঁকে ক্ষ্যাপা বা পাগল বললেও ভক্তের তাতে কিছু যায় আসে না। তাঁর অভীপ্সিত চরম লক্ষ্য লাভ করার দরুন অন্যের সমালোচনা তিনি গ্রাহ্য করেন না। এই হলো ভক্তিযোগ। তবে এই প্রাপ্তির মূল্য তাঁকে দিতে হয়। সর্বস্ব এমনকি দেহ পর্যন্ত তাঁকে সমর্পণ করতে হয়। গোপীরা নিজেদের বলতেন অশুল্ক দাসী। কারণ কৃষ্ণপ্রেমের বিনিময়ে তাঁরা কিছু চাননি, কিন্তু তাঁর পাদপদ্মে নিজেদের সম্পূর্ণরূপে দান করেছিলেন। ভক্তের কাছে কোন কিছু এমনকি নিজের সুখও কোন বিষয় নয়, তাঁর যা আছে সবই তাঁতে উৎসর্গীকৃত। তিনি সুখ চান না তাঁকেই চান সত্যি, তবে সুখ আসে অযাচিতভাবেই। তিনি আত্মনিবেদনের দ্বারা যথার্থ তাঁকে সেবা করতে পারলেই সুখী হন। এই হলো সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসা। হৃদয়ের ক্ষুদ্রতম প্রদেশেও অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর স্থান থাকে না। একেই বলা হয় একাভিমুখিতা, মাত্র

এক লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখী তাঁর চিত্ত। এই একাগ্র চিত্ততার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বৃন্দাবনের গোপীরা। তাঁরা ভগবানের জন্য সর্বস্ব এমনকি সামাজিক মানসম্মান পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন। এটাই গোপীপ্রেমের মাধুর্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্যই গোপীদের প্রেমকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলেছেন। এই প্রেম লাভই ভক্তিযোগের শেষ কথা।

শেষ করবার আগে সমস্ত আলোচনার সাররূপে বলতে পারি যে ভক্ত হতে গেলে বিদ্বান কিংবা কর্মী হবার প্রয়োজন নেই। অনেক যাগযজ্ঞ বা ধর্মানুষ্ঠান করার দরকার হয় না। এমনকি যেসব সাধারণ সামাজিক শিষ্ট আচরণ—তাও পালন করতে হয় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি অতি শুদ্ধাত্মা পুরুষ এবং তাঁর স্পর্শ এমনকি উপস্থিতি মাত্রই অপরকে পবিত্র করে। তাঁর স্পর্শেই পাপী সাধু হয়। ভক্তির এবং ভক্তের এমনই মাহাত্ম্য। শ্রীকৃষ্ণ ভাগবতে তাই বলছেন—গোপীদের সেই ভালবাসার প্রতিদান আমি কেমন করে দেব? গোপীরা আমাকে যে প্রেম নিবেদন করেছেন তার যথোপযুক্ত প্রতিদান আমি কোনভাবেই দিতে পারব না। ভক্ত ভগবানকে যেমনভাবে দেখেন (ভালবাসেন) ভগবানেরও ভক্তের প্রতি তেমন আকর্ষণ থাকে। সেইজন্যই তো শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে, এইসব মহৎ ভক্ত ও ঋষিরা যখন যে পথে যান আমি তাঁদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলি যাতে তাঁদের পদধূলি আমার উপর পড়ে এবং আমি পবিত্র ও ধন্য হই। ভক্তের কাছে ভগবানের এই ঋণী থাকা, ভক্তকে নিজের থেকে বড় বলে ঘোষণা করা, এ থেকে শ্রেষ্ঠ সম্মানদান জগতের ইতিহাসে কোথাও নেই।

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥